সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সুকুমার রায়ের জীবন ও কবিতা

Vol. 31 | No. 1 | 1987

Check for updates

Volume	31
Issue	1
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Mohammad Shahed
Published online	October 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v31i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v31i1.5
Pages	117-216
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সুকুমার রায়ের জীবন ও কবিতা

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

মাত্র তিনযুগেরও পঞ্চাশদিন কম সময় পৃথিবীতে বিচরণ করে বাংলা সাহিত্যের ধারায় যিনি সন্দেহাতীতভাবেই যুক্ত করেছিলেন বহুবিধ নতুন রস, রূপ ও মাত্রা, সেই ক্ষণজন্মা আধুনিক বাঙালী পুরুষটির নাম সুকুমার রায়। ঐতিহ্যবাহী রায় চৌধুরী পরিবারের সন্তান পরাধীন ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসী সংস্কারমুক্ত মানবতাবাদী এ-মানুষটির জন্মশতবর্ষ ১৯৮৭ সাল। তাঁর চিরসবুজ রচনাবলী সময়ের অগ্রযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে নতুন রূপ ও রস নিয়ে পাঠকদের সামনে এখনও উপস্থিত এবং এভাবেই সাহিত্যের ইতিহাসে চিরায়ত-স্রষ্টার মর্যাদায় তিনি অভিষিক্ত।

ক. পটভূমি ও পরিচয়

সুকুমার রায় জন্মেছিলেন অক্টোবর ৩০, ১৮৮৭ তারিখে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গের এক বিজ্ঞানমনস্ক সংস্কৃতিবান পরিবারে। বাংলা হিসেবে তাঁর জন্ম ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ১৩ই কার্তিক।

রায় চৌধুরী পরিবারের আদি-বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামে। সুকুমারের প্রপিতামহ লোকনাথ রায় পারদর্শী ছিলেন গণিতশাস্ত্র, জরীপ কাজে এবং আগ্রহ ছিল তন্ত্রসাধনায়। পিতামহ কালীনাথ রায় সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ দখলের জন্য 'মুনশী শ্যামসুন্দর' রূপেই অধিক পরিচিত ছিলেন। কালীনাথের পাঁচ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃতি অধ্যাপক সারদারঞ্জন, দ্বিতীয় কামদারঞ্জন (১৮৬৩-১৯১৫), তৃতীয় খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ মুক্তিদা-রঞ্জন, চতুর্থ শিল্পসাহিত্যিক ও আলোকচিত্রশিল্পী কুলদারঞ্জন এবং পঞ্চম 'বনের খবর' খ্যাত প্রমদারঞ্জন। আত্মীয় জমিদার হরিকিশোর

রায় চৌধুরী কালীনাথের দ্বিতীয় পুত্র কামদারঞ্জনকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন। নিঃসন্তান হরিকিশোর ভাবী-জমিদার কল্পনায় কামদা-রঞ্জন-এর নতুন নামকরণ করেন উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।[১] কিন্তু, পূর্ব বঙ্গের পল্লীপ্রকৃতির শোভায় লালিত শিশু উপেন্দ্রকিশোরের 'জমিদারী-শিক্ষা' শুরুতেই বাধার সম্মুখীন হয়। দেখা যায়,

> ...the adopted son was more absorbed in the charm of his flute than in learning how a Zamindari was operated. ...At school the teachers noticed Upendrakishore's pronounced artistic inclinations developing hand in hand with a passionate interest in the sciencs.... Young Ray's multisideness was cemented by his consuming attachment to music.[২]

স্বভাবতই চরিত্রের এই প্রবল বৈপরীত্যের মধ্যে 'জমিদারী-শিক্ষা' বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। এই পটভূমিতে উপেন্দ্রকিশোর চলে আসেন তৎকালীন সিপাহী বিপ্লবোত্তর বর্ধিষ্ণু নগরী কলকাতায়।

সুকুমার রায়ের জন্মের সমকালে উপেন্দ্রকিশোর কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের যে বাড়ীটার দ্বিতলে বাস করতেন, তার নীচতলায় ছিল সদ্য গড়ে ওঠা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় ও ছাত্রীবাস। তিনতলায় থাকতেন উপেন্দ্রপত্নী বিধুমুখী দেবীর পিতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কাদম্বিনী দেবীকে নিয়ে। ব্রাহ্মসমাজের উজ্জ্বল পুরুষ দ্বারকানাথের সমাজ-সংস্কারক মন তাঁকে টেনে নিয়েছিল সুদূর আসামের চা-বাগানে। উদ্দেশ্য কুলী সেজে কুলীদের ওপর অমানুষিক শোষণের চিত্র শিক্ষিত সমাজে প্রকাশ করা। সুকুমার-দিদিমা কাদম্বিনী দেবী ছিলেন ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার, যার প্রায় সমকালে কবি ঈশ্বরগুপ্ত ব্যঙ্গ করেছেন বি. এ. পড়া বাঙালী ললনার।[৩]

উপেন্দ্রকিশোর তৎকালের 'লিবারেল' মতবাদ বাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন কলেজে অধ্যয়নকালেই। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী, বিশেষত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় মেলে রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে গান পরিবেশনকালে যন্ত্রসঙ্গীত চালনায়, গানের স্টাফ নোটেশন তৈরীতে এবং রবীন্দ্র-কবিতার ইলাস্ট্রেশনে। তাঁদের পরিবারের নিয়মিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ মনীষী।[৪] এই বাড়ীর পরিবেশ সম্পর্কে পুণ্যলতা চক্রবর্তী পরবর্তী সময়ে লিখেছেন:

> বাবা বেহালা বাজাচ্ছেন, ছবি আঁকছেন। মা সেলাই করছেন, ঘরের কাজকর্ম করেছেন।... আমরা কোথাও বেড়াতে যাবার জন্য হৈ চৈ করে তৈরী হচ্ছি।... বাবার এক বন্ধু বলতেন, 'এ বাড়ীর মানুষগুলি সব সময়ই হাসছে।'[৫]

এ রকমের একটি সংস্কারমুক্ত সংস্কৃতিবান 'হাসি'র মধ্যে জন্ম সুকুমার রায় চৌধুরীর। তাঁরা ছিলেন তিন ভাই ও তিন বোন। জ্যেষ্ঠা সুখলতা রাও প্রোথিতযশা সাহিত্যিক, দ্বিতীয় সুকুমার রায়। অন্য ভাইবোনত্রয়—সুবিনয় রায়, সুবিমল রায় ও পুণ্যলতা চক্রবর্তী পরবর্তী সময়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে প্রতিষ্ঠিত।

বহুবিচিত্র গুণাবলী ও অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর কৃতিকে তাঁর দৌহিত্র সত্যজিৎ রায় অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন:

> ...যাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় তাঁর লেখায় গানে ছবিতে আর মুদ্রণের কাজে ছড়িয়ে আছে। বিজ্ঞান ও শিল্পের, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল উপেন্দ্রকিশোরের মধ্যে। বেহালার পাশে পাশে পাখোয়াজ বাজিয়েছেন তিনি, ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণের কাজে মৌলিক গবেষণা চালিয়েছেন, রাত্রে বাড়ির ছাতে বসে দূরবীণ চোখে দিয়ে আকাশের তারা দেখেছেন, অননুকরণীয় সুষমামণ্ডিত সহজ ভাষায় পৌরাণিক কাহিনী ও গ্রাম্য উপকথা নতুন করে লিখেছেন ছোটদের জন্য, আর সেই সঙ্গে খাস বিলিতি কায়দায় তেল-রঙ জল-রঙ ও কালি-কলমে ছবি এঁকেছেন।[৬]...

এই বহুমুখী প্রতিভার সস্নেহ সান্নিধ্য ও গভীর প্রভাবের মধ্যে লালিত হন সুকুমার। বাড়ীতে ছিল দিদিমা কাদম্বিনী দেবীর নরকঙ্কালসহ চেম্বার, ব্লক তৈরীর যন্ত্রপাতিতে ভর্তি বিরাট কারখানা, পিসেমশাই জগদীশ বসুর ভাগ্নে 'কুন্তলীন' খ্যাত হেমেন্দ্রমোহন বসুর প্রসাধনী তৈরীর কলকব্জা ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি।[৭] এসবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ সুকুমারের বিজ্ঞানী মন তৈরীতে সহায়ক হয়েছিল।

সুকুমার রায়ের ছন্দ-অনিসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যায় অতি শৈশবে। কবির অগ্রজা সুখলতা রাওয়ের ভাষায় :

Battering a toy violin to pieces
To find whence the tune came.[৮]

সুকুমারের অক্ষর-পরিচয় ঘটে বাড়ীর নীচতলার ব্রাহ্ম বালিকা স্কুলে।[৯] তৎকালে বহুলপ্রচলিত শ্লেট ও কাগজের ওপর সুকুমারের ছবি আঁকার হাতে খড়ি হয় ছ-সাত বছর বয়সে।[১০] আট বছর বয়সে শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পয়ারবন্ধে ১৬ পংক্তির পদ্য "নদী"।[১১] এর প্রথম কয়েকটি চরণ :

হে পর্ব্বত যত নদী করি নিরীক্ষণ,
তোমাতেই করে তারা জনম গ্রহণ।

ছোটবড় ঢেউ সব তাদের উপরে,
কল্ কল্ শব্দ করি সদা ক্রীড়া করে,
সেই নদী বেঁকে চুরে যায় দেশে দেশে,
সাগরেতে পড়ে গিয়া সকলের শেষে।...

পরের বছর 'মুকুল'-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ইংরেজী ছড়া Hickery, Dickery, Dock,-এর অনুসরণে সুকুমারের রচনা :[১২]

টিক্-টিক্ চলে ঘড়ি টিক্-টিক্-টিক্,
একটা ইঁদুর এল সে সময়ে ঠিক।...

পাশাপাশি চলছিল রায়চৌধুরী বাড়ীর ঘরোয়া আসরে সুকুমারের কৃতিত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ। পিতার সংগৃহীত জীবজন্তুবিষয়ক বই অবলম্বনে

ভাইবোনদের গল্পে মাতিয়ে রাখতেন তিনি। কারো উপর অসন্তুষ্ট হলে তাঁকে ব্যঙ্গ করে গল্প পরিবেশন করতেন। সান্ধ্য আসরে ছড়া-কাটার খেলায় অভাবনীয় চমক উপহার দিতেন।[১৩] যেমন একদিন ছড়া কাটা হচ্ছিল এভাবে:

---'একদা এক বাঘের গলায় ফুটেছিল অস্থি'
--'যন্ত্রণায় কিছুতেই নাহি তার স্বস্তি',
--'তিনদিন তিন রাত নাহি তার নিদ্রা'
--'সেঁক দেয় তেল মাখে লাগায় হরিদ্রা',

ক্রমে সুকুমার-পিতৃব্য মুক্তিদারঞ্জন যখন যুক্ত করলেন, 'ভিতরে ঢুকায়ে দিল দীর্ঘ তার চঞ্চু', তখন সুকুমার রায়ের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল 'বক সে চালাক অতি চিকিৎসক চঞ্চু' বলে ছড়াকাটার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।[১৪] এসবের পাশাপাশি নাটক করা এবং পুতুল তৈরী সুকুমারের কৈশোরক 'হবি' হিসেবে ক্রমশঃ প্রকাশ পেতে থাকে।

প্রায় প্রতি বছরই উপেন্দ্রকিশোরের পরিবার ময়মনসিংহের গ্রামের বাড়ীতে যেত। গ্রামের আকর্ষণের মধ্যে ছিল হাতী-চড়া, বন-বাদাড়ে বেড়ানো, পাখি-ধরা ইত্যাদি।[১৫]

ইতিমধ্যে উপেন্দ্রকিশোরের পরিবার ২২ সুকিয়া স্ট্রিটে উঠে আসে, যে বাড়ীতে 'ইউ রায় এণ্ড সন্স'-এর বিরাট কারখানা। ওদিকে সুকুমার সিটি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। সিটি স্কুলে তিনি শিক্ষক হিসেবে সাহচর্য লাভ করেন প্রোথিতযশা শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের।[১৬] ১৯০৬ সালে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে ডাবল অনার্স নিয়ে বি. এসসি. পাশ করেন তিনি। অভিনব সাহিত্যসভা 'ননসেন্স ক্লাব'-এর প্রতিষ্ঠা এবং ক্লাবের মুখপত্র হিসেবে 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'-র প্রকাশ সুকুমারের অনার্স পাশ-পরবর্তী সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সত্যজিৎ রায়ের মতে ননসেন্স ক্লাবের নামকরণের মধ্যেই সুকুমার-সাহিত্যের মূল ধারাটি কোন-দিকে প্রবাহিত হবে তার ইঙ্গিত ছিল।[১৭] সমসাময়িকদের আলোচনা থেকে জানা যায় যে সুকুমার রায় বা 'তাতাদা' ছিলেন এই ননসেন্স ক্লাবের কেন্দ্রীয় চরিত্র। ননসেন্স ক্লাবে সুকুমারের ছড়া রচনা আরও

একধাপ অগ্রসর হয় যখন তিনি 'instinctively rhymed, putting ideas together'।[১৮] সুকুমার রায়ের প্রথম দুটি নাটক 'ঝালাপালা' ও 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ননসেন্স ক্লাবে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লেখা।[১৯] এই ক্লাবের আমন্ত্রণপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে 'ইলাস্ট্রেটর' সুকুমার রায়ের অভ্যুদয় ঘটে।

এই পর্বে সুকুমারের কিছুটা সময় কাটে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সাহচর্যে।[২০] এই সাহচর্য স্বভাবতই সুকুমারের সাহিত্য ও শিল্পভাবনাকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে। রবীন্দ্রনাথের কৌতুক ও প্রহসনমূলক রচনাসমূহ এবং অবনীন্দ্রনাথের ফোকমটিভ সম্পন্ন চিত্র তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপ্রসাদ বৃত্তি নিয়ে মুদ্রণ ও আলোক-চিত্রে উচ্চশিক্ষার জন্য সুকুমার রায় সমুদ্রপথে বিলেত যাত্রা করেন ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে।[২১] প্রথমে তিনি ইংলণ্ডের 'এল-সি. সি. স্কুল অব ফটোয়েনগ্রেভিং এন্ড লিথোগ্রাফী'তে ভর্তি হন। ইউরোপে তিন বছরের প্রবাসজীবন সুকুমার রায়ের সামনে বিশ্বের আধুনিক সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার এক নতুন জীবন ও জগতকে উন্মোচিত করে। এসময়ে তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে পাবলো পিকাসোর চিত্রকলা, ফ্রিট্জ ক্রেসলারের বেহালা এবং উইলিয়াম রোদেনস্টেইনের সঙ্গ।[২২]

'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লন্ডনে পৌছেন ১৯১২ সালের জুন মাসে। সেবারে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে লন্ডনে এবং তার বাইরে আবারও কিছুটা সময় কাটে সুকুমারের। লন্ডনের কোয়েস্ট সোসাইটিতে 'দি স্পিরিট অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর' সহ নানা সভা-সমিতিতে ভারতীয় সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তিনি।[২৩] রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু কবিতার ইংরেজী অনুবাদও করেন সুকুমার রায়। প্রসঙ্গতঃ এর পরের বছরই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সে বছরই (১৯১৩) উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বঙ্গের বিস্ময়কর শিশু-সাময়িকী 'সন্দেশ'। প্রবাস থেকেই সন্দেশের জন্য ছড়া ও ছবি পাঠাতে শুরু করেন সুকুমার রায়।[২৪]

বিলেতের প্রবাস জীবনে সুকুমার লন্ডনের কাউন্টি স্কুল অব ফোটো-য়েনগ্রেভিং এন্ড লিথোগ্রাফী এবং মানচেস্টার মিউনিসিপ্যাল স্কুল অব টেকনোলজীতে তৎকালীন আধুনিক মুদ্রণপদ্ধতি এবং মুদ্রণ-যন্ত্র সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। পাশাপাশি হাফটোন ব্লক ও মুদ্রণ-সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে তিনি লন্ডনের মুদ্রণ বিশেষজ্ঞদের উদ্দেশে ব্যবহারিক শিক্ষাসহ বক্তৃতা প্রদান করেন। এ-সময়ে 'পেন্‌রোজেস পিক্‌টোরিয়াল এনুয়েল'-এর দুটি বার্ষিক সংখ্যায় (১৯১২ ও ১৯১৩-১৪) সুকুমারের "হাফটোন ফেক্টস্ সামারাইজড্" এবং "স্ট্যান্ডা-রাইজিং দি অরিজিন্যাল" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় প্রকাশিত হয়। এছাড়াও "ব্রিটিশ জার্নাল অব ফটোগ্রাফী'র ১৯১৩ সালের জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর "পিন হোল্ থিয়োরী"। সুকুমারের এ-পর্বের চিঠি-পত্রে তাঁর উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির বহু নকশা দেখতে পাওয়া যায়।[২৫] পাশাপাশি লন্ডনের আর্ট গ্যালারীগুলিতে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি ও ছবির কাজ, গ্রন্থাগারে হিন্দু দেবতার মুখাকৃতি সন্ধান, যাদুঘর-সমূহ পরিদর্শন, আধুনিক ছাপাখানায় হাতেকলমে শিক্ষা, ভোজসভায় সংগীত ও নৃত্যের উদ্দাম উল্লাস প্রভৃতিও তাঁর প্রবাসজীবনের সঙ্গী ছিল।[২৬]

আলোকচিত্র ও মুদ্রণে পদক ও পুরস্কার লাভের কৃতিত্বসহ উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে সুকুমার রায় কলকাতায় ফিরে আসেন ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বরে, সমুদ্রপথে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হয়ে।[২৭] ইতিপূর্বে (১৯১২-১৩) তিনি জার্মানী, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, ইতালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন।[২৮] বিলেতের 'রয়েল ফটোগ্রাফিক সোসাইটি'র 'ফেলো'র সম্মানও লাভ করেন তিনি।[২৯] ২৬ বছর বয়সে ঢাকার প্রখ্যাত সমাজকর্মী কালীনারায়ণ গুপ্তের নাতনী সুপ্রভা দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন সুকুমার। ১৯১৪ সালে উপেন্দ্রকিশোর সপরিবারে ১০০ গড়পার রোডের নতুন বাড়ীতে আবাস স্থাপন করেন।[৩০] এই পর্বে 'সন্দেশ'-এ সুকুমার রায়ের লেখার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯১৫ সালে মৃত্যুশয্যায় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী 'সন্দেশ' সম্পাদনার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন সুকুমার রায়কে। সত্যজিৎ রায়ের ভাষায়:

...সন্দেশের ভার স্কন্ধে ন্যস্ত হবার পর থেকেই সুকুমারের শিশুসাহিত্য সৃষ্টি দিনে দিনে বেড়ে চলে। শুধু গল্প কবিতা নয়; নানান বিষয়ে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ, সারা বিশ্বের খুঁটিনাটি খবর, দেশ-বিদেশের উপকথা, স্বরচিত ধাঁধা, হেঁয়ালি ইত্যাদিতে সন্দেশের পাতা ভরে উঠে।...

...১৯১৫ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত আট বছর সুকুমার সন্দেশ সম্পাদনা করেছিলেন। তার মধ্যে শেষের আড়াই বছরের অধিকাংশ সময়ই তাঁর রোগশয্যায় কেটেছে। লেখা ও আঁকার দিক দিয়ে তার শ্রেষ্ঠ কীর্তির প্রায় সবই এই আড়াই বছরে।[৩১]...

'সন্দেশ' সম্পাদনাকালে ননসেন্স ক্লাবের উত্তরসুরী 'মান্‌ডে ক্লাব' বা 'সভা সম্মেলন' [সুকুমারের ভাষায়]-এ প্রধান সংগঠকের ভূমিকা পালন সুকুমার রায়ের বহুমাত্রিক জীবনের আর একটি দিক। অভিনব এ-সাহিত্যসভার তখনকার সভ্যদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই 'ক্লাবের আলোচনাচক্রে প্লেটো-নীট্‌শে থেকে শুরু করে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-বৈষ্ণবকবিতা-রবীন্দ্রকাব্য কিছুই বাদ পড়ত না।'[৩২] মান্‌ডে ক্লাবের আমন্ত্রণও রচিত হত সুকুমারের অনবদ্য কৌতুকমিশ্রিত পদ্য দিয়ে। তৎকালীন কলকাতায় সাহিত্যচর্চায় মান্‌ডে ক্লাবের উজ্জ্বল ভূমিকা এখন স্বীকৃত।

এই সময়ে সুকুমার রায় একাধিকবার বিভিন্ন উপলক্ষে শান্তি-নিকেতনে যান। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুকুমারের গানে সুর দেন, রবীন্দ্র জন্মবাসরে (১৯১৭) 'শব্দকল্পদ্রুম' নাটক অভিনীত হয়, শান্তি-নিকেতনে পূর্ববঙ্গ সম্মেলনে সুকুমার রায় সভাপতিত্ব করেন—এসব ঘটনা দুই কবির আমৃত্যু সখ্যতার পরিচয়বহ।[৩৩]

এই পর্বে সুকুমার রায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষেত্র ছিল ব্রাহ্মসমাজ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্যমণ্ডলীর অন্যতম সুকুমার রায় সমাজের বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে নিয়মিত বেদীগ্রহণ করতেন।[৩৪] ব্রাহ্ম-যুবকদের একত্রিত করে ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে নতুন প্রাণধারা সঞ্চারেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। 'সমাজের

আদিপর্বের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তাঁকে যেমন উদ্বুদ্ধ করত, মনে হয় ঠিক সেই পরিমাণেই তাঁকে হতাশ করেছিল সমকালীন কিছু আদর্শচ্যুতির দৃষ্টান্ত'।[৩৫] ১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যপদ প্রদানকে কেন্দ্র করে সমাজের নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্বে সুকুমার রায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-সহযোগে নবীনদের নেতৃত্ব দেন এবং জয়ী হন ১৯২১ সালের মার্চের ভোটাভুটিতে।[৩৬] ব্রাহ্মসমাজের অনেক রীতিনীতি ও সংস্কারের তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে তাঁর যুক্তিবাদী মনে ব্রাহ্মমত সম্পর্কেই বিভিন্ন সংশয় জাগ্রত হয়।[৩৭]

রোগশয্যায় 'সন্দেশ' সম্পাদনার পাশাপাশি মুদ্রণে নতুন উদ্ভাবনের প্রয়োগ, 'আবোল-তাবোল'-এর প্রথম সংস্করণের অঙ্গসজ্জা, 'বর্ণমালা-তত্ত্ব'-রচনা প্রভৃতি তিনি করে গেছেন অনায়াস সরলতায়।[৩৮] রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে গীত সঙ্গীত শয্যাশায়ী সুকুমারের বিশেষ প্রিয় হয়ে ওঠে জীবনের শেষপর্বে। রবীন্দ্রনাথ সুকুমার রায়ের এ-সময়ের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন :

> ...আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি কিন্তু এই অল্প বয়স্ক যুবকটির মত, অল্পকালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান করতে প্রায় আর কাউকে দেখিনি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন।...[৩৯]

পাশাপাশি সত্যজিৎ রায়ের চোখে সুকুমার রায়ের মৃত্যুশয্যার একটি দৃশ্য :

> The most vivid image of his father that Satyajit Ray has ...is that Sukumar in an Oxygen mask still dictating a nonsense rhyme.[৪০]

১৯২৩ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর, ২৩শে ভাদ্র ১৩৩০ বাংলা সাহিত্য-জগতের এই অসাধারণ স্রষ্টা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

খ. সৃষ্টিসম্ভারের রূপরেখা : সাহিত্য

সুকুমার রায়ের ওপর প্রকাশিত বিভিন্ন আলোচনা-গ্রন্থ, নিবন্ধ, সুকুমার সাহিত্য সমগ্রের বিভিন্ন সংস্করণ পাঠে অনুমিত হয় যে অনার্স- ...

পূর্ববর্তী সময়ে তাঁর রচনাসংখ্যা ছিল নগণ্য। সে-হিসেবে সুকুমার রায়ের সমুদয় সৃষ্টিই ১৯০৭ থেকে ১৯২৩, এই সতের বছরের মধ্যে রচিত। সুকুমারের জীবিতকালে তাঁর রচিত একমাত্র প্রকাশিত পুস্তক 'অতীতের ছবি'। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'আবোল তাবোল' -এর অঙ্গসজ্জা, মলাট-অঙ্কন ও প্রুফ-সংশোধনসহ প্রিন্ট-অর্ডার সুকুমার প্রদত্ত হলেও পুস্তকটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর নয় দিন পরে।

ইউ. রায়, অ্যান্ড সন্স প্রকাশিত 'আবোল তাবোল' তিন লাইনের পদ্যে ভূমিকাসহ ৪৫টি শিরোনামাঙ্কিত পদ্য ও ৫টি শিরোনামাহীন পদ্য নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯২৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর। 'আবোল তাবোল'-এর অধিকাংশ কবিতা প্রথম 'সন্দেশ'এ প্রকাশিত হয়। তবে গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করার পূর্বে সুকুমার রায় এ-সকল রচনা পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং সম্পাদনা করেন।[৪১] কয়েকটি কবিতা সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকেই এ-পুস্তকে মুদ্রিত হয়। নিম্নে 'আবোল-তাবোল'-এর পদ্যসমূহের 'সন্দেশ'-এ প্রকাশকাল, এবং নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্র্যাকেটে 'সন্দেশ'-এ ব্যবহৃত নাম উল্লেখ করা হলো :[৪২]

> খিচুড়ি, মাঘ ১৩২২ ; কাঠবুড়ো [আবোল তাবোল], ফাল্গুন ১৩২২ ; গোঁফ চুরি, চৈত্র ১৩২২ ; লড়াই ক্ষ্যাপা [ঐ আমাদের পাগলা জগাই], বৈশাখ ১৩২২ ; কাতুকুতু বুড়ো, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২; গানের গুঁতো [আবোল তাবোল], ভাদ্র ১৩২২ ; খুড়োর কল [আবোল তাবোল], ফাল্গুন ১৩২২ ; ছায়াবাজি, আষাঢ় ১৩২৩ ; কুমড়োপটাশ, শ্রাবণ ১৩২৩; হাতুড়ে, ভাদ্র ১৩২৩ ; সাবধান, অগ্রহায়ণ, ১৩২৩; হুকোমুখো হ্যাংলা, চৈত্র ১৩২৩ ; দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্ [আবোল তাবোল], আষাঢ় ১৩২৪ ; নারদ নারদ, আশ্বিন ১৩২৪ ; কি মুস্কিল, মাঘ ১৩২৪ ; চোরধরা, চৈত্র ১৩২৪; ভুতুরে খেলা [আবোল তাবোল], বৈশাখ ১৩২৫ ; রামগরুড়ের ছানা [হেস না], জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ ; ভয় পেয়ে না [ভয় কিসের?], আষাঢ় ১৩২৫ ; হাত গণনা [দুঃখের কথা], শ্রাবণ ১৩২৫ ; কিম্ভূত, আশ্বিন ১৩২৫ ; নেড়া বেলতলায় যায় কবার [আবোল তাবোল], অগ্রহায়ণ ১৩২৫ ; বুড়ীর বাড়ী, পৌষ ১৩২৫ ; বুঝিয়ে বলা [অবুঝ], মাঘ ১৩২৫ ; আহলাদী, ফাল্গুন ১৩২৫;

কাঁদুনে, বৈশাখ ১৩২৬ ; ফস্‌কে গেল [ঐ যা !], জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ ; হুলোর গান, শ্রাবণ ১৩২৬ ; ডানপিটে, ভাদ্র ১৩২৬ ; বিজ্ঞান শিক্ষা [বিজ্ঞান পাঠ], আশ্বিন ১৩২৬; নোট বই [জিজ্ঞাসু], বৈশাখ ১৩২৭ ; শব্দকল্পদ্রুম্, আশ্বিন ১৩২৭ ; বাবুরাম সাপুড়ে [বাপ্‌রে], আষাঢ় ১৩২৮ ; ট্যাশ্ গরু, ফাল্গুন ১৩২৮ ; একুশে আইন, ভাদ্র ১৩২৯ ; বোম্বাগড়ের রাজা [কেন ?], কার্তিক ১৩২৯ ; অবাক কাণ্ড, কার্তিক ১৩২৯ ; ভাল রে ভাল, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ ; পালোয়ান, ভাদ্র ১৩৩০।

লক্ষণীয় যে 'আবোল তাবোল' প্রকাশের সময় সুকুমার রায় মোট ১৬টি পদ্যের শিরোনামা পরিবর্তন করেন, 'সন্দেশ'-এ যার ৬টির শিরোনামা ছিল "আবোল তাবোল"। পাণ্ডুলিপি থেকে সরাসরি যে-সকল পদ্য সম্ভবত এই পুস্তকে মুদ্রিত হয় তার মধ্যে রয়েছে "আবোল তাবোল" শীর্ষক সূচক এবং পরিসমাপ্তিসূচক পদ্যদ্বয় যা কবির মৃত্যু-শয্যায় রচিত এবং "সৎপাত্র", "প্যাঁচা আর প্যাঁচানি", "ঠিকানা" ও "গল্প বলা"। পুস্তকে মুদ্রিত শিরোনামাহীন ৫টি পদ্য "ছড়া: ছিটে-ফোঁটা" নামে বৈশাখ ১৩২৮ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ সংখ্যার 'সন্দেশ'-এ মুদ্রিত হয়েছিল।[৪৩]

সুকুমার রায়ের মৃত্যুর ২৭ বছর পরে [সেপ্টেম্বর ১৯৫০] সিগনেট প্রেস প্রকাশ করে কবির দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কাব্য "খাই খাই"। ২৯টি শিরোনামাঙ্কিত এবং ৩টি শিরোনামাহীন পদ্য-এর সঙ্গে 'শব্দ-কল্পদ্রুম' নাটকের বিশ্বম্ভরের সংগীতের সম্পাদিত অংশ সূচনায় যুক্ত করে প্রকাশিত হয় "খাই খাই"। সিগনেট সংস্করণে এই পুস্তকের কয়েকটি পদ্যের শিরোনামা পরিবর্তন করা হলেও পরবর্তী সময়ে তা গৃহীত হয়নি। 'সন্দেশ'-এ প্রথম প্রকাশের সময়সহ "খাই খাই" পুস্তকের সূচীপত্র নিম্নরূপ:[৪৪]

[১৩২২]— বর্ষ গেল, বর্ষ এল ; নন্দগুপী ;

[১৩২৩]— গ্রীষ্ম ; সঙ্গীহারা ; হিতে বিপরীত ; পড়ার হিসাব ; কাজের লোক ; বর্ষশেষ ;

[১৩১৪]— পাকাপাকি ; অসম্ভব নয় ;

[১৩২৫]— বর্ষার কবিতা ; জীবনের হিসাব ; খাই খাই ; তেজিয়ান ; আড়ি ;

[১৩২৬]— নিরুপায়; হরিষে বিষাদ; পরিবেষণ; শ্রাবণে; নিঃস্বার্থ; আশ্চর্য;

[১৩২৭]— দাঁড়ের কবিতা; মূর্খ মাছি; হারিয়ে পাওয়া; হিংসুটিদের গান; সাধে কি বলে গাধা; জালা-কুঁজো সংবাদ; নাচের বাতিক;

[১৩২৯]— বিষম চিন্তা।

'খাই খাই'-এর শিরোনামাহীন রচনাগুলি গৃহীত হয়েছিল ১৩২৭ সনের আশ্বিন ও ১৩২৯ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সন্দেশ' থেকে।

সুকুমারের জীবিতকালে প্রকাশিত একমাত্র পুস্তক 'অতীতের ছবি' সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাসোৎসবের অন্যতম আকর্ষণ বালক-বালিকা সম্মেলনে বিতরণের জন্য (মাঘ ১৩২৯, জানুয়ারী ১৯২২) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৫] মোট ৬টি পর্বে বিন্যস্ত 'অতীতের ছবি'র পংক্তি সংখ্যা প্রায় ৫০০।

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সুকুমার রায় রচনা-সংগ্রহের বিভিন্ন সংস্করণে উপরি-উক্ত তিনটি পুস্তক ছাড়াও অন্যান্য কবিতা বা সমজাতীয় শিরোনামে কবির আরও কিছু পদ্য প্রকাশিত হয়। এগুলি প্রকাশের পূর্বে সনাক্তকরণ সম্পর্কে সম্পাদকের বক্তব্য হচ্ছে:

> উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনাকালে 'সন্দেশ'-এ রায়চৌধুরী পরিবারভুক্ত কোনো লেখকের রচনা নামাঙ্কিত থাকত না। সুকুমার রায়ের সম্পাদনাকালেও সেই নিয়ম কিছুকাল প্রচলিত ছিল; পরে শুধু রায় পরিবারের, বয়োজ্যেষ্ঠদের নাম বাদে, অধিকাংশ রচনায় লেখকের নাম মুদ্রিত হত না। সম্পাদক হিসেবে সুকুমার রায় অন্য লেখকের রচনা যথেষ্টরকম সংশোধন ও পরিমার্জনা করতেন। সেহেতু, সুকুমার রায়ের রচনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া দুঃসাধ্য ছিল। সৌভাগ্যক্রমে, কবি স্বয়ং 'সন্দেশ' পত্রিকায় মুদ্রিত তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা রেখে যান; কবিপত্নী সুপ্রভা রায় সেই তালিকাটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেন। 'অন্যান্য কবিতা'র কবিতাগুলি সেই তালিকা অনুসারেই আহৃত হয়েছে।[৪৬]...

এ-যাবৎ সংগৃহীত ও মুদ্রিত সুকুমার রায়ের এ-ধরনের পদ্যের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। তার মধ্যে শিরোনামাহীন কয়েকটি পদ্যও রয়েছে। 'সন্দেশ'-এ এর অধিকাংশ প্রথম প্রকাশিত হয়, যার বিবরণ নিম্নরূপ :[৪৭]

[১৩২০]— বেজায় রাগ ; খোকা ঘুমায় ;
]১৩২১]— মেঘ ; দিনের হিসাব ;
[১৩২২]— নতুন বৎসর ; সন্দেশ ; ছুটি ; বেজায় খুসি ; বড়াই ;
[১৩২৩]— লোভী ছেলে ; কানে খাটো বংশীধর ;
[১৩২৪]— আবোল তাবোল ; অন্ধ মেয়ে ; ও বাবা ; সাহস ;
[১৩২৫]— আজব খেলা ; ছুটি ;
[১৩২৬]— লক্ষ্মী ; আয়রে আলো আয় ; মনের মতন ;
[১৩২৭]— কত বড় ; আলো-ছায়া ; কানা-খোঁড়া সংবাদ ;[৪৮] আদুরে পুতুল ; মেয়ের খেয়াল ;
[১৩২৮]— ভারি মজা ; ছিটেফোঁটা ; নাচন ; বিচার ;
[১৩২৯]— বন্দনা ; খোকার ভাবনা ; বুঝবার ভুল ; ভাল ছেলের নালিশ ; ছবি ও গল্প ; বাবু ; শিশুর দেহ ;
[১৩৩০]— বিষম ভোজ ; গ্রীষ্ম ; বিষম বাগু ; আনন্দ ; কিছু চাই।

মৃত্যুর ৩৩ বছর পর [শ্রাবণ ১৩৬৩] প্রকাশিত সুকুমার রায়ের একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ'[৪৯]-এ কবির তিনটি পদ্য প্রকাশিত হয়। এগুলি হচ্ছে "বর্ণমালাতত্ত্ব", "সমালোচনা" ও "সম্পাদকের দশা।" এর প্রথম রচনাটি মৃত্যুশয্যায় রচিত ও অসমাপ্ত এবং শেষ রচনাটি নন্‌সেন্স ক্লাবের হাতে লেখা পত্রিকা 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'য় প্রথম প্রকাশিত। 'বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ'-এর অন্যান্য রচনা হলো :

ভাষার অত্যাচার ; ক্যাবলের পত্র ; চিরন্তন প্রশ্ন ; দৈবেন দেয়ম ; শিল্পে অত্যুক্তি ; ফটোগ্রাফী ; ভারতীয় চিত্রশিল্প ; The Spirit of Rabindranath Tagore ; The Burden of the Common Man ।

সুকুমার রায়ের নাটক রচনার সূত্রপাত পরিবারের নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনে। প্রথম যৌবনে (১৯০৫) তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিতে

রাম্‌স্‌ডেন সাহেবের জব্দ হওয়ার কল্পিত বিবরণ দিয়ে রচনা করেন 'রামধন বধ'।[৫০] কিন্তু এই নাটকটির পাণ্ডুলিপি এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

'ঝালাপালা' এবং 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'—সুকুমার রায় এই দুটি নাটক রচনা করেন ননসেন্স ক্লাবে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে। নাটকদ্বয় ১৯১১ সালে রচিত এবং 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩৩১ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ও ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায়, সুকুমারের মৃত্যুর পরে।[৫১]

সুকুমার রায়-রচিত 'ভাবুক-সভা' তাঁর অঙ্কিত চিত্রসহ 'প্রবাসী'র ১৩২১ সনের আশ্বিন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।[৫২] ১৯১৫ সালে রচিত 'শব্দকল্পদ্রুম্‌' বহু পরে প্রকাশিত হয় 'অলকা' পত্রে (মাঘ ১৩৪৬)।[৫৩] একই সময়ে রচিত 'চলচিত্তচঞ্চরি' 'বিচিত্রা'র আশ্বিন, ১৩৩৪ সংখ্যায় মুদ্রিত হয় নাট্যকারের মৃত্যুর পরে।[৫৪] সুকুমার রায়ের তিনটি নাটক—'অবাক জলপান', 'হিংসুটি' ও 'মামা গো' প্রকাশিত হয় তাঁর সম্পাদনাকালে 'সন্দেশ' পত্রিকার যথাক্রমে ১৩২৭ সনের জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র ও চৈত্র সংখ্যায়।[৫৫] তবে সুকুমারের কয়েকটি নাটকের রচনাকাল নিয়ে আলোচকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়।[৫৬]

সুকুমার রায়ের অভিনব কাহিনীগল্প, বাংলা Fantasy ও Nonsense-এর জগতে এখনও যা মাইলস্টোন, 'হ য ব র ল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'সন্দেশ'-এর ১৩২৯ সনের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায়।[৫৭] এর রচনাকাল প্রকাশকালের সমসাময়িক (১৯২২)।

মৃত্যুর ১৭ বছর পর (নভেম্বর ১৯৪০) সুকুমারের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'পাগলা দাশু' প্রকাশ করে এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌স। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকাসম্বলিত এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মোট গল্পের সঠিক সংখ্যা গ্রন্থটির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে এখনও নিরূপণ করা যায়নি। ১৯৪৬ সালে সিগনেট প্রেস প্রকাশিত 'পাগলা দাশু'র পরবর্তী সংস্করণে পূর্ববর্তী সংস্করণের ৫টি গল্প বর্জিত হয় এবং কয়েকটি গল্প সংযোজিত হয়। দুই সংস্করণ মিলিয়ে 'পাগলা দাশু'তে মোট গল্পের সংখ্যা ২৫। এর সমস্ত গল্পই সন্দেশে প্রকাশিত হয়েছিল, যার বিবরণ নিম্নরূপ :[৫৮]

[১৩২৩]—আশ্চর্য কবিতা; নূতন পণ্ডিত; জগিৎদাসের মামা; পাগলা দাশু;

[১৩২৪]—চীনে পট্‌কা; চালিয়াৎ; পেটুক; হাসির গল্প; সবজান্তা; নন্দলালের মন্দ কপাল; ডিটেকটিভ; দাশুর কীর্তি;

[১৩২৫]—বাজে গল্প ১; কালাচাঁদের ছবি; বাজে গল্প ২; বাজে গল্প ৩; ভোলানাথের সর্দারি;

[১৩২৬]—ব্যমকেশের মাজ্জা;

[১৩২৭]—আজব সাজা;

[১৩২৮]—ভুল গল্প;

[১৩২৯]—যতীনের জুতা; হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি; দাশুর খ্যাপামি; সবজান্তা দাদা;

[১৩৩০]—গোপালের পড়া।

'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত সুকুমারের আরও ১৩টি গল্প এবং কয়েকটি ছড়া সমন্বয়ে সিগনেট প্রেস 'বহুরূপী' প্রকাশ করে ১৯৪৪ সালে। 'সন্দেশ'-এ প্রকাশকালসহ 'বহুরূপী'র সূচীপত্র হলো :[৫৯]

[১৩২২]—গল্প;

[১৩২৩]—দ্রিঘাংচু;

[১৩২৪]—এক বছরের রাজা; হিংসুটি;

[১৩২৫]—দুই বন্ধু; গরুর বুদ্ধি;

[১৩২৬]—ছাতার মালিক; অসিলক্ষণ পণ্ডিত;

[১৩২৭]—ব্যাঙের রাজা; ডাকাত নাকি; পুতুলের ভোজ;

[১৩২৮]—উকিলের বুদ্ধি;

[১৩২৯]—বুদ্ধিমান শিষ্য।

উক্ত দুটি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এরকম বেশ কিছু গল্প প্রকাশিত হয়েছে সুকুমার রায়ের বিভিন্ন রচনাসংগ্রহে। সুকুমার ও সুপ্রভাকৃত তালিকা থেকে পদ্যের ক্ষেত্রে উল্লেখিত পদ্ধতিতে এই গল্পগুলি সনাক্ত করা হয়েছে; 'সন্দেশ'-এ যার প্রকাশকাল হলো :[৬০]

[১৩২০]—ওয়াসিলিসা;

[১৩২১]—দেবতার সাজা; পাজি পিটার; টিয়াপাখীর বুদ্ধি;

[১৩২২]---বোকা বুড়ি; রাগের ওষুধ; ব্যাঙের সমুদ্র দেখা;
[১৩২৩]---খুকীর লড়াই দেখা; ছয় বীর; ভাঙা তারা; খৃষ্টবাহন;
[১৩২৪]----পালোয়ান; নাপিত পণ্ডিত; সত্যি; হারকিউলিস; ঠুকে-মারি আর মুখে-মারি; বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়;
[১৩২৫]----আশ্চর্য ছবি; অফিয়ুস; কুকুরের মালিক; দেবতার দুর্বুদ্ধি;
[১৩২৬]---বুদ্ধিমান শিষ্য; অন্ধের বর চাওয়া;
[১৩২৭]---সূদন ওঝা; লোলির পাহারা; টাকার আপদ;
[১৩২৮]----রাজার অসুখ;
[১৩২৯]----দানের হিসাব।

উল্লেখ্য যে, এর অধিকাংশ গল্পই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকার গল্পের বাংলা রূপান্তর।

'সন্দেশ'-এর পাতায় সুকুমার রায় লিখিত বিশ্বের স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের জীবনী প্রকাশ শুরু হয় ১৩২৩ সনে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ও ভিন্ন ভিন্ন কালের মোট ১৩ জন বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, অভিযাত্রী, বীর, দার্শনিক প্রমুখের জীবনী নিয়ে সুকুমার-রচিত ১৬টি নিবন্ধের 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত তালিকা নিম্নরূপ:[৬১]

[১৩২৩]---ডেভিড লিভিংস্টোন; পাস্তুর; সক্রেটিস; ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল; অজানা দেশে;
[১৩২৪]---গ্যালিলিও; আর্কিমিডিস; কলম্বস; সামান্য ঘটনা; ডারুইন;
[১৩২৫]---খোঁড়া মুচির পাঠশালা; পণ্ডিতের খেলা; নোবেলের দান; জোয়ান;
[১৩২৬]---দানবীর কার্নেগী; পিপাসার জল।

প্রসঙ্গতঃ সুকুমার রায় উপরি-উক্ত "অজানা দেশে" নিবন্ধ আফ্রিকা অভিযাত্রী মাঙ্গো পার্ক; "সামান্য ঘটনা"য় রবার্ট ব্রুস, নিউটন, গ্যালভানি, হাইলম্যান ও এলিয়াস হাউস; "খোঁড়া মুচির পাঠশালা"য় জন পাউন্ডস; "পণ্ডিতের খেলা" নিবন্ধে নিউটন, মার্কনি, মাইকেল ফ্যারাডে, এডিসন, 'পিলট ডাউল খুলি' আবিষ্কারকদ্বয় ও জগদীশ

বসু এবং "পিপাসার জল" নিবন্ধে ফিলিপ সিডনি, রুডলফ প্রমুখের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

জীবজন্তু বিষয়ক ৩৬টি রচনা নিয়ে আনন্দ পাবলিশার্স সুকুমার রায়ের 'জীব-জন্তু' প্রকাশ করে ১৯৭৪ সালে, লেখকের মৃত্যুর অর্ধ-শতাব্দী পরে। এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধসমূহের 'সন্দেশ'-এ প্রকাশ তালিকা হলো :৬২

[১৩২১]—গরিলা ; সেকালের লড়াই ;

[১৩২২]—রাক্ষুসে মাছ ;

[১৩২৩]—ফড়িং ; পেকাড়ি ; সেকালের বাঘ ; অদ্ভুত কাঁকড়া ; জানোয়ারওয়ালা ; সেকালের বাদুড় ; সিন্ধু ঈগল ; জানোয়ারের প্রবাসযাত্রা ;

[১৩২৪]—ঘোড়ার জন্ম ; প্রাচীন কালের শিকার ; বিদ্যুৎ মৎস ; তিমির খেয়াল ; গোখুরো শিকার ; পাখির বাসা ; কুমিরের জাতভাই ; সমুদ্রের ঘোড়া ; গরিলার লড়াই ; বর্মধারী জীব ; ধনঞ্জয় ; শামুক ঝিনুক ;

[১৩২৫]—মাছি ; অদ্ভুত মাছ ; জানোয়ারের ঘুম ; তিমির ব্যবসা ; জানোয়ার ইঞ্জিনিয়ার ; প্লাটিন ; নাকের বাহার ; নিশাচর ;

[১৩২৬]—বেবুন ; সিংহ শিকার ; অলিপুরের বাগানে ;

[১৩২৭]—খাঁচার বাইরে ; খাঁচার জন্তু ;

[১৩২৯]—লড়াইবাজ জানোয়ার ;

[১৩৩০]—মানুষমুখো।

জীবনী এবং জীবজন্তু পর্যায়ের বাইরে সুকুমার রায়ের বিবিধ নিবন্ধের সংখ্যা ৭০। 'সন্দেশ'-এ প্রকাশকালসহ এর সূচী নিম্নরূপ :৬৩

[১৩২০]—সূক্ষ্ম হিসাব ; শিকারী গাছ ;

[১৩২১]—কাগজ ; লুপ্ত সহর ; ডুবুরি জাহাজ ; পাতালপুরী ; উঁচু বাড়ি ; রাবণের চিতা ;

[১৩২২]—ডুবুরী ;

[১৩২৩]—ছাপাখানার কথা ; কাপড়ের কথা ; পার্লামেন্টের ঘড়ি ; রেলগাড়ীর কথা ; সূর্যের কথা ; ডাকঘরের কথা ; অসুরের দেশ ; নীহারিকা ; মাটির বাসন ; ঘুড়ি ও ফানুস ;

[১৩২৪]—ক্লোরোফর্ম ; মরুর দেশ ; যুদ্ধের আলো ; প্রলয়ের ভয় ; ধুলার কথা ; আকাশ আলেয়া ; আষাঢ়ে জ্যোতিষ ; অলংকারের কথা ; গাছের ডাকাতি ; কয়লার কথা ; জাহাজডুবি ;

[১৩২৫]—আশ্চর্য আলো ; পিরামিড ; দক্ষিণ দেশ ; ভূমিকম্প ; মানুষের কথা ; মেঘবৃষ্টি ; মজার খেলা ; লাইব্রেরী ; বেগের কথা ; আগুন ;

[১৩২৬]—পৃথিবীর শেষ দশা ; নৌকা ; ব্যস্ত মানুষ ; সমুদ্র বন্ধন ; লোহা ; শনির দেশে ; কাঁচ ; শরীরের মালমশলা ; অতিকায় জাহাজ ; আকাশপথের বিপদ ; সেকালের কীর্তি ;

[১৩২৭]—চীনের পাঁচিল ; চাঁদমারি ; বায়োস্কোপ ; ভুঁইফোড় ; মামার খেলা ; ডাকের কথা ; কাঠের কথা ; হাওয়ার ডাক ;

[১৩২৮]—হেঁয়ালি নাট্য ; আহ্লাদী মিনার ; আদ্যিকালের গাড়ি ; নকল আওয়াজ ;

[১৩২৯]—আশ্চর্য প্রহরী ; আকাশবাণীর কল ; যদি অন্য রকম হত ; জলস্তম্ভ ;

[১৩৩০]—আজব জীব ; বুমেরাং ।

দ্রষ্টব্য যে এর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক, ভৌত ও জীববিজ্ঞান এবং ইতিহাস ও আবিষ্কারসংক্রান্ত কাহিনীর একচ্ছত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

সুকুমার রায়ের দুটি বাল্যরচনা "নদী" ও "টিক্-টিক্-টং" এবং বিলেতের *Penrsoes Pictorial Annual*-এ প্রকাশিত Halftone Facts Summerized ও Standardizing the Original এবং *The British journal of Photography*-তে মুদ্রিত Pink-hole Theory এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ইংরেজী অনুবাদ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাঁর রচনাসমগ্রের তালিকায় এর সঙ্গে যুক্ত করা যায় 'মুকুল' আশ্বিন ১৩১৩ সংখ্যায়

মুদ্রিত কবির গদ্যরচনা "সূর্যের রাজ্য", 'সন্দেশ'-এর ১৩১১ সনের আগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় যথাক্রমে প্রকাশিত "ভীষ্ম" ও "মহাভারত আদি পর্ব" এবং 'হিজিবিজি 'নামক খসড়া খাতা থেকে উদ্ধারকৃত "শ্রীগোবিন্দ-কথা"।[৬৪] সঙ্গে আরও রয়েছে সুকুমার-রচিত "প্রেমের মন্দিরে তাঁর আরতি বাজে" ও "নিখিলের আনন্দগান এই প্রেমেরি যুগলবন্দনায়" শীর্ষক গানদ্বয়সহ বহু ব্রাহ্মসংগীত,[৬৫] 'সন্দেশ'-এর পাতায় ফিলার হিসেবে মুদ্রিত বহুসংখ্যক ধাঁধা ও হেঁয়ালি, ছড়ায় রচিত নন্‌সেন্স ক্লাব ও মান্ডে ক্লাবের বহু আমন্ত্রণপত্র, পদ্যে রচিত বহু সংখ্যক চিঠিপত্র,[৬৬] 'এক্ষণ'-এ প্রকাশিত "বিলেতের চিঠি" ও "বিলেতের আরো চিঠি",[৬৭] লীলা মজুমদার সংকলিত সুকুমার রায়ের পত্রাবলী,[৬৮] 'তত্ত্বকৌমুদী', 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত তাঁর বক্তৃতাসমূহ।[৬৯] তবে এ-সত্ত্বেও অনেকে মনে করেন যে সুকুমার রায়ের বহু রচনা এখনো অচিহ্নিত অবস্থায় রয়েছে।[৭০] আবার কারও কারও মতে সুকুমারের নামে সম্প্রতি মুদ্রিত কিছু রচনা প্রকৃতপক্ষে উপেন্দ্রকিশোরের।[৭১] এ-সব বিতর্ক মীমাংসা সাপেক্ষে এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে সুকুমার-সমগ্রের পরিসংখ্যান দাঁড়ায় :

কবিতা	:	১৪২
গল্প	:	৬৬
নাটক	:	৯
নিবন্ধ	:	১৩৫

এবং ধাঁধা, নিমন্ত্রণপত্র, গান, বক্তৃতা প্রভৃতি।

মাত্র ৩৬ বছর বয়সী একজন স্রষ্টার বহুসংখ্যক বহুবিচিত্র রচনাবলীর এই তালিকা আমাদেরকে বিস্মিত না করে পারে না।

সুকুমার রায়ের কবিতা : রস ও রূপ

'আবোল-তাবোল'-এর প্রকাশকালে সুকুমার রায় "কৈফিয়ৎ" নামে যে ক্ষুদ্র ভূমিকা এই পুস্তকে যুক্ত করেন, তার একটি অংশ লেখকের রস-চেতনার পরিচয়বাহী। সুকুমার রায় এতে লেখেন :

> ...ইহা খেয়ালরসের বই। সুতরাং, সে রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।[৭২]

পাশাপাশি সুকুমারের খেরোর খাতার ডায়েরী 'হিজিবিজি' খাতার একটি পাতায় পাওয়া যায়ঃ

> রসের মাঝে মজবি যদি মন,
> বাস্তবের এই বস্তুলীলার তত্ত্বকথা শোন্।
> জড়জগতের বাস্তুভিটায় বস্তু করেন বাসা
> নিংড়ে দেখ রসের মধু মৌচাকে তার ঠাসা।[৭৩]

এই দুটি উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সুকুমার রায় তাঁর 'আবোল তাবোল' জাতীয় রচনার রসকে "খেয়াল রস"রূপে চিহ্নিত করতে আগ্রহী ছিলেন, যার অবস্থান 'জড়জগতের বাস্তুভিটায়'—কল্পনার জগতে নয়। দুঃখের বিষয়, সুকুমারের মৃত্যু-পরবর্তী ৬৫ বছরেও এই খেয়ালরসের রূপ ও মাত্রা বাংলা অলংকারশাস্ত্রে আলোচিত হয়নি। সুকুমার রায়ের কবিতা মূল্যায়ন এবং বাংলা কবিতার ধারায় তাঁর যথাযথ স্থাননির্ধারণে অধিকাংশ সমালোচকের সীমাবদ্ধতার মূল কারণ উক্ত রসের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের ব্যর্থতার মধ্যে নিহিত মনে করা অসঙ্গত হবে না।

প্লেটো-এরিস্টটল থেকে আধুনিক সাহিত্যতাত্ত্বিক পর্যন্ত প্রবহমান সাহিত্য-সমালোচনার ধারায় হাস্যরস কিংবা কমেডী কখনো উচ্চ-স্থান লাভ করেনি। ভারতীয় আলংকারিকেরা নয়টি রসের মধ্যে হাস্য-রসকে স্থান দিলেও তার তত্ত্বনির্মাণে বিস্তারিত আলোচনা দুর্লভ। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন পর্বে হাস্যরস নেই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হাসির যে উপাদান, তা প্রায় সর্বাংশেই স্থূল এবং অনেকাংশে রুচি-বর্জিত।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসকে ভাঁড় ও সং-এর হাত থেকে মুক্ত করে আধুনিক রচনায় স্থান দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুকুমার রায় সেই রসকে উপনীত করেন একটি নতুন তল বা স্তরে। কবি ও সমালোচক অজিত দত্ত বিস্ময়মিশ্রিত প্রশংসায় বলেন :

> সে-হাস্যরস এমন প্রবল, এতই নূতন ধরনের, এরূপ অসূয়া-বর্জিত এবং উদ্বেল যে, সুকুমার রায়কে বিনা দ্বিধায় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক বলে অভিনন্দন জানানো চলে।[৭৪]

এই রসের উৎকর্ষ অনুভব করা যায় যখন হবু শ্বশুরকে ভাবী জামাতা গঙ্গারাম ও তার স্বজনদের করুণ অবস্থা বর্ণনা করে সান্ত্বনা দেওয়া হয় এই বলে যে,

কিন্তু তারা উচ্চঘর,
কংসরাজের বংশধর!
শ্যাম লাহিড়ী বনগ্রামের
কি যেন হয় গঙ্গারামের।—
["সৎপাত্র", 'আবোল তাবোল']

কিংবা বিদ্যেবোঝাই বাবু নৌকার মাঝিকে অনেক উপদেশ দানের পর যখন নদীতে ঝড়ে নৌকা ডুবুডুবু এবং

মাঝি শুধায়, "সাঁতার জানো?" মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, "মশাই, এখন কেন কাবু?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।"
["জীবনের হিসাব", 'খাই খাই']

অথবা গাছে পাখী, নীচে ধামাধারী গোষ্ঠ মামা, শিকারী ভাগ্নে পাখীকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে; কিন্তু

ঐ যা! গেল ফস্কে ফেঁসে—হেঁই মামা তুই ক্ষেপ্‌লি শেষে?
খ্যাঁচ্ করে তোর পাঁজর ঘেঁসে লাগ্‌ল কি বাণ ছট্‌কে এসে-ফট্?
["ফসকে গেল", 'আবোল তাবোল']

হাস্যরসের এই অভাবনীয় নতুন বিস্তারের কিংবা এই রসের পরিশীলিত উৎকৃষ্ট প্রয়োগের কার্যকারণসূত্রটি ব্যাখ্যা করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'পাগলা-দাশু'-র এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের (নভেম্বর ১৯৪০) ভূমিকায় কবি লিখেছেন:

সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁর ভাব সমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতী আনে। তাঁর

> স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল সেইজন্যই তিনি তাঁর বৈপরীত্য এমন খেলা ছলে দেখাতে পেরেছিলেন। বঙ্গ সাহিত্যে ব্যঙ্গ রসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়েছে, কিন্তু সুকুমারের হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না।[৭৫]...

এভাবেই সুকুমার রায়ের খেয়ালরসের সৃষ্টি সার্থক হয়েছে। মৃত্যুর পাঁচ যুগ পরও এই রসধারায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অনতিক্রম্য।

বহিরঙ্গে আপাদমস্তক 'হাসি' যাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁর অন্তরের গাম্ভীর্য ও গভীরতা আবার আমাদেরকে বিস্মিত না করে পারে না। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রবীণ নেতা হেরম্বচন্দ্র মৈত্র একবার সুকুমার রায়কে প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁর জীবনের আদর্শ কি? উত্তরে সুকুমার রায় বলে-ছিলেন, সিরিয়াস ইন্টারেস্ট ইন লাইফ।[৭৬] সুকুমার রায় নিজে "ফটোগ্রাফী" নিবন্ধে লিখেছেন:

> আমরা হাল্কাভাবে শিল্পচর্চা করি বলিয়াই শিল্প আমাদের আয়ত্ত হয় না।[৭৭]

স্পষ্টতঃ জীবনাচরণে এবং সাহিত্যচিন্তায় যুবক সুকুমার রায় তর্কাতীতভাবেই 'সিরিয়াস' ছিলেন। এ-ধরনের গম্ভীর ও গভীর মনোলোক থেকে কীভাবে কেন সৃষ্টি হলো 'হাসি'র একটি অমলিন স্রোতধারা, এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সুকুমার রায়ের উদ্ভট বা Nonsense, Absurd, Farce, Fantasy প্রভৃতি জাতীয় রচনার পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত।

ননসেন্স-এর দার্শনিক রূপে পরিচিত জি. কে. চেস্টারটন এই শতকের শুরুতে *The Defendant* গ্রন্থের A Defence of Nonsense (১৯০১)-এ লিখেছিলেন :

> This simple sense of wonder at the shapes of things, and at their exuberant independence of our intellectual standards and our trivial definitions, is the basis of spirituality as it is the basis of nonsense. Nonsense and faith (strange as the conjunction may seem) are

the two supreme symbolic assertions of the truth that to draw out the soul of things with a sollogism is as impossible as to draw out Leuiathan with hook.[৭৮]

কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু ননসেন্সকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এর উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর মতে, 'ননসেন্স আর কিছুই নয়; আধুনিক সমীকরণের বিরুদ্ধে তির্যক বিদ্রোহঘোষণা।'[৭৯]

সুকুমার রায়ের ননসেন্স রচনার মূল কৌশল human experiences exaggeration বা অতিরেক ও অসঙ্গতি নির্মাণ। মানব-জীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার অত্যুক্তি যুক্ত করে তৈরী হয়েছে সুকুমার রায়ের ননসেন্স-এর পৃথিবী, স্বয়ং কবির ভাষায় যা আজগুবি, উদ্ভট ও অসম্ভব।[৮০] এর বহিরঙ্গের রূপাবয়বটি লঘু ও হাস্যময়, কিন্তু অন্তর সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ ও গম্ভীর গভীর। সুকুমার রায় নিজে বিশ্বাস করতেন যে হাস্যরস ও গম্ভীররস একই সঙ্গে অবস্থান করে এবং ভিত্তিমূলে গাম্ভীর্য না থাকলে হাসির প্রাসাদ আপন ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না।[৮১]

সুকুমার রায়ের ননসেন্স চকিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যখন এক-কালের প্রবল প্রতাপশালী রাজা সম্পর্কে প্রশ্ন উচ্চারিত হয়:

সভায় কেন চেঁচায় রাজা "হুক্কা হুয়া ব'লে"?
মন্ত্রী কেন কল্‌সী বাজায় ব'সে রাজার কোলে?
সিংহাসনে ঝোলায় কেন ভাঙা বোতল শিশি?
কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিসী?...
["বোম্বাগড়ের রাজা", 'আবোল তাবোল']

অফিসের বড়কর্তা গোঁফ চুরির কল্পনায় যখন নিজের গোঁফকে নিজের বলে অস্বীকার করে অধঃস্তনদের নাস্তানাবুদ করে বলেন:

"এ গোঁফ যদি আমার বলিস করব তোদের জবাই"—
এই না বলে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।
... ...
"গোঁফকে বলে তোমার আমার-গোঁফ কি কারো কেনা?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।"
["গোঁফ চুরি", 'আবোল তাবোল']

তখনও ননসেন্স নতুন এক রূপে হয় প্রকাশিত।

যথার্থ আপাত-অর্থহীন ননসেন্সও সুকুমারে আছে। যেমন:

এক যে ছিল রাজা—(থুড়ি,
রাজা নয় সে ডাইনি বুড়ি)!
তার যে ময়ূর——(না না,
ময়ূর কিসের? ছাগল ছানা)।
উঠানে তার থাকত পোঁতা——
—(বাড়িই নেই, তার উঠান কোথা)?
["আবোল তাবোল", 'অন্যান্য কবিতা']

লক্ষণীয় যে সুকুমার রায়ের এই 'অতিরেক' বা 'অসঙ্গতি'র সৃষ্টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাতে সীমা-অতিক্রম নেই, দ্বিরুক্তি কিংবা ঢিলে-ঢালা ভাব নেই। সুকুমার রায় যে এ-সম্পর্কে কত সচেতন ছিলেন, তার চিহ্ন রয়েছে "শিল্পে অত্যুক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশে। যেমন:

...অত্যুক্তি জিনিসটাও...শিল্পসঙ্গত হইতে পারে,...

শিল্পের প্রচলিত পদ্ধতিগুলি যখন নিতান্ত অভ্যস্ত ও মামুলী হইয়া আসে, তখন তাহারই প্রতিক্রিয়ারূপে যে সকল নব্যতন্ত্রের আবির্ভাব হয়, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই একটা অত্যুক্তির ধুয়া দেখিতে পাওয়া যায়।...

...তাই বলিয়া তাহাকে [অত্যুক্তিকে] মাথায় চড়িতে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়।[৮২]...

সচেতনভাবে এই সীমানারক্ষা ও সংযমের গুণেই সুকুমার রায়ের ননসেন্স অনন্যসাধারণ। স্মর্তব্য যে সুকুমার রায়ের পূর্বে অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুর ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের রচনায় ননসেন্সের উপাদান চকিতে চমক দিলেও বাংলা সাহিত্যের ধারায় প্রথম সার্থক ননসেন্স সাহিত্য সৃষ্টির কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে সুকুমারের প্রাপ্য।

বুদ্ধদেব বসু মনে করেন যে সুকুমারের ননসেন্স অতি উচুঁ-দরের, কাব্যের কষ্টিপাথরে বিচার করলে যার মূল্য কমার পরিবর্তে অনেকখানি বেড়ে যায়।[৮৩] সুকুমার সেনের মতে "আবোল তাবোল" ননসেন্স ভার্স-এর যথার্থ বাংলারূপ।[৮৪] আর অজিত দত্তের ভাষায়

এই আবোল তাবোলেই 'অতি-লঘুতার সঙ্গে অতি-গভীরতার যে সমন্বয় ঘটেছে, আপাত-অর্থহীন কৌতুকের সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম তাৎপর্য যেরূপ আশ্চর্যরূপে মিশে গেছে, বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা বিরল।'[৮৫] রাজশেখর বসু আবোল তাবোলকে *Alice in Wonderland*-এর চেয়ে উচ্চ-শ্রেণীর রচনা মনে করে বলেন যে চিত্র ও তক্ষণকলায় impressionistic Style এবং অবাস্তব সংস্থান দ্বারা রসসৃষ্টির পদ্ধতি সুকুমার রায় এতে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন।[৮৬]

সুকুমার রায় রচিত আপাত-অর্থহীন কবিতার মধ্যে কতটা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ সুপ্ত আছে, তা তাঁর কিছু সংখ্যক রচনা বিশ্লেষণে প্রমাণ করা সম্ভব। এর সংক্ষিপ্ত সূত্র নিম্নরূপ :

সামন্তবাদের অবশেষকে ব্যঙ্গ > "নেড়া বেলতলায় যায় কবার", "বোম্বাগড়ের রাজা",

আমলাতন্ত্রকে ব্যঙ্গ > "গোঁফ চুরি", "রামগরুড়ের ছানা"; ইংরেজ প্রণীত দমনমূলক আইনের নিন্দা > "সাবধান", "একুশে আইন" ;

ব্রিটিশ প্রশাসনের বিচার প্রসহনকে ব্যঙ্গ > "বিচার"; ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন আশ্বাসকে সন্দেহ > "কাতুকুতু বুড়ো", "ভয় পেয়ো না", "অসম্ভব নয়" ;

কংগ্রেস কর্তৃক প্রথম মহাযুদ্ধকালীন ইংরেজদেরকে সহায়তার নিন্দা > "গানের গুঁতো", "লড়াই ক্ষ্যাপা";

অহিংসা আন্দোলনে নির্যাতনের চিত্র > "বাবুরাম সাপুড়ে" ;
সন্ত্রাসবাদের প্রতিচিত্র > "ডানপিটে" ;
অবৈজ্ঞানিক দেশীয় পণ্যকে ব্যঙ্গ > "খুড়োর কল", "ছায়াবাজি", "বিজ্ঞান শিক্ষা" ;
স্বদেশী ফিরিঙ্গিদের ব্যঙ্গ > "ট্যাঁশ গরু" ;
কৌলিণ্যকে ব্যঙ্গ > "সৎপাত্র" ;
সমাজের দারিদ্র্য উন্মোচন > "বুড়ীর বাড়ী"।

সুকুমার রায়ের কবিতাসমগ্রে ননসেন্স রচনার পাশাপাশি Satire, humour, এমন কি Nursury Rhyme জাতীয় রচনার সংখ্যাও অল্প

নয়। তাঁর Satire বা ব্যঙ্গপদ্য বিষয়নির্বাচনে এবং উপস্থাপনার ভঙ্গীতে অনবদ্য। উদাহরণ হিসেবে "কি মুস্কিল!" শীর্ষক রচনাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। Bookworm পণ্ডিত যখন তথ্যবহুল গ্রন্থের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন আকস্মিকভাবে শিং উঁচানো ষাঁড়ের তাড়ায় দিশেহারা হয়ে মনে হয়—

সব লিখেছে, কেবল দেখ পাচ্ছিনেকো লেখা কোথায়—
পাগ্‌লা ষাঁড়ে কর্‌লে তাড়া কেমন ক'রে ঠেকাব তায়!
["কি মুস্কিল!" 'আবোল তাবোল']

কিংবা একদল ছেলে যখন একটি ছাগলকে উত্যক্ত করছিল, আর জনৈক উপদেশদাতা তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টায় রত, তখন

...ছাগল ভাবে সামনে একি!
একটুখানি গুঁতিয়ে দেখি।
গুঁতোর চোটে ধড়াধ্বড়
হুড়মুড়িয়ে ধুলোয় পড়।...
["হিতে বিপরীত", 'খাই খাই']

এই তীক্ষ্ণ Wit-সমৃদ্ধ Satire বাংলা পদ্যের ধারায় বিরল।

আধুনিক বাংলা ছড়ার রূপ-গঠন এবং লিখিত বাংলা সাহিত্যের ধারায় ছড়াকে একটি বিশেষ genre রূপে প্রতিষ্ঠা সুকুমার রায়ের কৃতির আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ছড়া জাতীয় রচনার সূত্রপাত করেন কবি ঈশ্বরগুপ্ত। এই ছড়ার ধারাকে যাঁরা প্রবহমান রাখেন, তাঁদের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। তাত্ত্বিক বিবেচনায় এই ছড়াকারদের মধ্যে আবার যোগীন্দ্রনাথ সরকার ব্যতীত অন্যদের রচনায় খাঁটি ছড়ার সংখ্যা নগণ্য। যোগীন্দ্রনাথের ছড়াকে যদি আধুনিক বাংলা ছড়ার ভিত্তিরূপে বিবেচনা করা হয়, তবে সুকুমার রায়ের ছড়া বহুতল বিশিষ্ট প্রাসাদস্বরূপ। স্মর্তব্য যে যোগীন্দ্রনাথের সার্থক ছড়া-সংকলন 'হিজিবিজি' (প্র. ১৯১৬)-র ছড়াসমূহ 'আবোল-তাবোল'-এর ছড়ার প্রায় সমকালীন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র সফল ছড়াগ্রন্থ 'খাপছাড়া' (প্র. ১৯৩৬)-র প্রায় দুই দশক পূর্ববর্তী।[৮৭]

আধুনিক বাংলা ছড়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ;[৮৮] যেমন লঘু ভাষা, প্রাকৃত ছন্দে দৃঢ়বদ্ধ গঠন, সংক্ষিপ্ত পরিসর, ধ্বনি ও চিত্র প্রাধান্য, সুরাশ্রয়ী, স্নিগ্ধ রসবিশিষ্ট প্রভৃতি উপাদান সুকুমার রায়ের ছড়ায় উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। যেমন :

শুনেছ কি ব'লে গেল সতীনাথ বন্দ্যো ?
আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ ?
টকটক থাকে নাকো হ'লে পরে বৃষ্টি—
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।
[শিরোনামহীন, 'আবোল তাবোল']

কিংবা

নন্দঘোষের শাম্‌লা গরু
ভাগলো কোথায় লক্ষ্মীছাড়া ?
নন্দ ছোটে বনবাদাড়ে,
সন্ধানে যায় বদ্যিপাড়া ;
শেষকালেতে অর্ধরাতে,
হদ্দ হ'য়ে ফিরলে পরে—
বাসায় দেখে, ঘুমোয় গরু
ল্যাজ গুটিয়ে গোয়াল ঘরে।
[শিরোনামহীন, 'অন্যান্য কবিতা']

সুকুমার রায়ের এই জাতীয় রচনাগুলি এখনও আধুনিক বাংলা ছড়ার আদর্শরূপে বিবেচিত হয়।

তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা, যেমন নিমন্ত্রণপত্র, চিঠিপত্র প্রভৃতিও যে কত সরস ও শিল্পোত্তীর্ণ হতে পারে, তার নমুনাও সুকুমার রায়ের কবিতা-সমগ্রে ছড়িয়ে আছে। নন্‌সেন্স ক্লাব ও মান্ডে ক্লাবের নিমন্ত্রণপত্র-সমূহ এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ।[৮৯] উচ্চশিক্ষার্থে বিলেতযাত্রার পূর্বে বন্ধুবান্ধবদের বিদায়ী ভোজে আমন্ত্রণ জানিয়ে যে পত্রটি তিনি প্রেরণ করেন, তাতেও তাৎক্ষণিক রচনার উৎকর্ষ প্রস্ফুটিত :

ক'রে তাড়াহুড়ো বিষম চোট্‌
কিনেছি হ্যাট্‌ কিনেছি কোট্‌,
পেয়েছি Passage এসছে Boat,

বেঁধেছি তল্পি তুলেছি মোট্,
বলেছে সবাই, "তা হ'লে ওঠ্,
আসান্ এবার বিলেতে ছোট্।"
তাই সভা হবে, বিদায় ভোট্,
কাঁদ কাঁদ ভাবে ফুলিয়ে ঠোঁট্
হেথায় সকলে করিবে জোট্
(প্রোগ্রামটুকু করিও Note)।

প্রোগ্রাম—

শুক্রসন্ধ্যা সঠিক সাত—
আহার, আমোদ, উল্কাপাত।[৭০]

ছন্দে লেখা ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেও সুকুমার রায়ের উচ্চ রসবোধ ও সাহিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ পূর্বে উল্লেখিত [টীকা ৬০ দ্র.] চিঠির প্রথম চারটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যায়:

গিরিধি আরামপুরী, দেহ মন চিৎপাত;
খেয়ে শুনে হু হু করে কেটে যায় দিনরাত;
হৈ চৈ হাঙ্গামা হুড়োতাড়া হেথা নেই;
মাস বার তারিখের কোনো কিছু ল্যাঠা নেই;

সুকুমার রায়ের কবিতাসমগ্রে কিছু উৎকৃষ্ট অনূদিত পদ্যেরও অবস্থান আছে। বাল্যে রচিত (১৩৯৬) Hickery, Dickery, Dock-এর অনুবাদ তৎকালে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অনূদিত কয়েকটি মাত্র ছড়ার একটি। আরও পরে Father William-এর ভাবাবলম্বনে তিনি নাচের বাতিক; 'ইংরেজী ছড়ার আভাসে' "ছড়া : ছিটেফোঁটা" "মূর্খ-মাছি" প্রভৃতি রচনা করেন। অনূদিত ছড়ায়ও সুকুমার সমানভাবে সফল। যেমন :

রং হল চিঁড়েতন, সব গেল ঘুলিয়ে,
গাধা যায় মামাবাড়ি টাকে হাত বুলিয়ে।
বেড়াল মরে বিষম খেয়ে, চাঁদের ধরল মাথা,
হঠাৎ দেখি ঘর বাড়ি সব ময়দা দিয়ে গাঁথা॥
["ছড়া : ছিটেফোঁটা", 'অন্যান্য কবিতা']

বিলেতে প্রবাসকালে সুকুমার রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি কবিতা ও কবিতার অংশ-বিশেষের ইংরেজী অনুবাদ করেন। এই কবিতাবলীর মধ্যে ছিল "পুনর্মিলন", "হৃদয়ের গীতিধ্বনি", "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ", "সুদূর", "ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে" প্রভৃতি। এসকল অনুবাদে ইংরেজী কাব্যভাষার ওপর সুকুমারের দখলের নমুনা রয়েছে। যেমন, 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর 'পুনর্মিলন' কবিতার অনুবাদ :

There is a forest called the heart;
[হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,]
Endless, it extends on all sides.
[দিশে দিশে নাহিকো কিনারা,]
Within its mazes I lost my way
[তারি মাঝে হনু পথহারা।]
Where the tree with branced etwined
Nurse the darkness in its bosom.
[সে বন আঁধারে ঢাকা,
গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।]
['বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ', পৃ. ১০২]

সুকুমার রায় রচিত দীর্ঘ কবিতার মধ্যে রয়েছে প্রায় ৫০০ পংক্তির 'অতীতের ছবি', দেড় শতাধিক পংক্তির "কাণা-খোঁড়া সংবাদ" এবং অসমাপ্ত "মহাভারত" প্রভৃতি। এ-ধরনের রচনাসমূহের মধ্যে মৃত্যুশয্যায় রচিত অসমাপ্ত "বর্ণমালাতত্ত্ব" ব্যতিক্রমধর্মী। বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পর্যায়ক্রম অনুসরণ করে সূক্ষ্মধ্বনি-চেতনা ও অনুপ্রাসের একটি চমৎকার পরিণতি "বর্ণমালাতত্ত্ব"-এ উপস্থিত। সুকুমার রায় এই কবিতার ১২৫ পংক্তির মধ্যে একটি পদ্য ভূমিকাসহ 'অ' থেকে 'চ' পর্যন্ত বর্ণ অনুপ্রাসে ব্যবহার করেছিলেন। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ 'ঙ'-পর্যন্ত কবির রচনায় সজীব হয়ে উঠেছিল এভাবে :

বিকল অঙ্গ, ভগ্নজঙ্ঘ, এ কোন্ পঙ্গু মুনি?
কেন ভাঙা ঠ্যাঙে ডাঙায় নামিল, বাঙালা মুলুকে শুনি?

রাঙা আঁখি জ্বলে, চাঙা হয়ে বলে, ডিঙাব সাগর গিরি,
কেন চণ্ড ধরি, ব্যাঙাচির মতো, লাঙুল জুড়িয়া ফিরি
['বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ']

এভাবে কবিতাটির স্তবকে স্তবকে ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব শিল্পরূপের বন্ধনে প্রকাশিত। কবি এই রচনাটি সমাপ্ত এবং সম্পাদনার সুযোগ পেলে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ধারার কবিতার সৃষ্টি হতে পারত, তাতে সন্দেহ নেই।

কবিতা রচনায় সুকুমার রায়ের স্বকীয়তা বিশিষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর ভাষাব্যবহার ও শব্দনির্বাচনের গুণে। এ-বিষয়ে কবি যে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন তার সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর প্রবন্ধের বিভিন্ন ছত্রে। যেমন, "ভারতীয় চিত্রশিল্প" প্রবন্ধে :

> কাব্যের "ভাষা" নামক জিনিসটা কতকগুলি নির্দিষ্ট শব্দ বা তৎসূচক চিহ্নাদি দ্বারা ভাব বিনিময়ের একটা সাঙ্কেতিক উপায় মাত্র।... কবি তাহার মানসমূর্তিকে ভাষায় বর্ণনা করেন,[৭১]...

অন্যত্র 'ভাষার অত্যাচার' শীর্ষক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> ভাষা যে নিজের অর্থগৌরবেই সত্য, একথা ভুলিয়া সে যখন কেবলমাত্র শব্দগৌরবে বড় হইতে চায়, তাহার অত্যাচার অনিবার্য। চিন্তা কোনোদিনই শব্দের দ্বারা নিঃসন্দেহ-রূপে ও সম্যকরূপে ব্যক্ত হইতে পারে না।[৭২]

সুকুমার রায়ের কাব্যভাষা সাধারণভাবে সরল; কিয়ৎপরিমাণে তৎকালে প্রচলিত মৌখিক ভাষার নিকটবর্তী। কিন্তু এই সাধারণ ভাষাই কবিতার অবয়বগঠনে অনন্যসাধারণ হয়ে ওঠে উপস্থাপনার ভঙ্গীতে, স্থাপনার নির্ভুলতায়, সুদৃঢ় বন্ধনে, পরিস্থিতিকল্পনায়, ভাবব্যঞ্জনায় এবং সর্বোপরি বাক্যরচনার বৈশিষ্ট্যে। যেমন :

গালভরা হাসিমুখে চালভাজা মুড়ি,
ঝুর্‌ঝুরে প'ড়ো ঘরে থুর্‌থুরে বুড়ী।
কাঁথাভরা ঝুল্‌কালি, মাথাভরা ধুলো,

মিট্ মিটে ঘোলা চোখ, পিটখানা কুলো।...
["বুড়ীর বাড়ী", 'আবোল তাবোল']

এর প্রতিটি বাক্য সাধারণ শব্দমালার সমন্বয়ে রচিত হলেও, তা পূর্বোক্ত গুণাবলীর কারণে আকর্ষণীয়। কয়েকটি কবিতায় প্রচলিত মৌখিক ভাষার ছাপ সুস্পষ্ট :

আরে আরে জগমোহন—এস, এস, এস—
বল্‌তে পার কোথায় থাকে আদ্যানাথের মেশো?
আদ্যানাথের নাম শোননি? খগেনকে তো চেনো?...
["ঠিকানা", আবোল তাবোল']

বাংলা শব্দের ওপর সুকুমার রায়ের অসামান্য দখলের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কবিতাসমগ্রে। "শব্দকল্পদ্রুম!" "দাঁড়ের কবিতা" কিংবা "খাই খাই" শীর্ষক রচনায় তিনি রীতিমত শব্দ নিয়ে খেলা করেছেন। "খাই খাই"তে তিনি খাই ক্রিয়াপদটিকে এভাবে বহু ব্যবহার করেছেন :

খাই খাই কর কেন, এস বস আহারে...
জল খায়, দুধ খায়, খায় যত পানীয়,...
জ্যাঠাছেলে বিড়ি খায়, কান ধরে টানিও।...
সুদ খায় মহাজন, ঘুষ খায় দারোগায়।...

লক্ষণীয় যে 'খাই' শব্দকে এই কবিতায় তিনি অন্ততঃ ৪০টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বাংলা ক্রিয়াপদের বহুমাত্রিক ব্যবহারের স্বরূপ উন্মোচনের পাশাপাশি এর সৃজনশীল প্রয়োগেও সুকুমার রায় অদ্বিতীয়।

উদ্ভট শব্দতৈরী বাংলা সাহিত্যে সুকুমার রায়ের আর একটি কৃতি। কবিতায় এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ "খিচুড়ি"। এতে এ-ধরনের শব্দের মধ্যে রয়েছে হাঁসজারু (হাঁস+সজারু), বকচ্ছপ (বক+কচ্ছপ), হাতিমি (হাতি+তিমি), প্রভৃতি। অবশ্য সুকুমার সেনের মতে এই সৃষ্টি শব্দবিদ্যাসম্মত।[৯৩] শব্দবিদ্যায় এই উদ্ভট কৃত্রিম শব্দের নাম পোর্টম্যান্টো শব্দ—ইংরেজী সাহিত্যে ল্যুইস্ ক্যারল, জেমস জয়েস যার উদ্ভাবক।

উদ্ভট শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সুকুমারের বৈশিষ্ট্য তার পাশাপাশি সাধারণ প্রচলিত শব্দের ব্যবহার করা। জনৈক গবেষক পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন যে 'আবোল তাবোল' গ্রন্থে উদ্ভট শব্দবিশিষ্ট বাক্যের সংখ্যা মাত্র শতকরা ১১ ভাগ। সুকুমার রায়ের স্বভাবজাত এই পরিমিতিবোধ এভাবে তাঁর শব্দভাণ্ডারের ভারসাম্য রক্ষা করেছে।

ভাষা ও শব্দের মতো সুকুমার রায় একনিষ্ঠভাবে ছন্দ-সচেতন ছিলেন। 'আবোল-তাবোল' এর সূচক কবিতায় তিনি লিখেছেন:

...আয়রে তবে ভুলের ভবে
অসম্ভবের ছন্দেতে॥

অন্যত্র, "বর্ণমালাতত্ত্ব"-এর দ্বিতীয় স্তবকে কবির মন্তব্য:

...ভাষা-প্রাঙ্গনে স্বরে-ব্যঞ্জনে ছন্দ করেন লীলা।

এছাড়াও সুকুমার রায়ের একাধিক নাটক এবং গল্পেও তাঁর ছন্দ-সচেতন মনের প্রকাশ ঘটেছে।

উনিশ শতকের কবিদের কাব্যরচনার সূত্রপাত হত সাধারণভাবে অক্ষরবৃত্ত রীতির পয়ার দিয়ে। আট বছরের বালক সুকুমারের "নদী" রচনায়ও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু এর পরের বছরই Hickery, Dickery, Dock-এর অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেন। পরে সুকুমার রায়ের দুই যুগের রচনায় এই স্বরবৃত্ত নতুন তাল ও সুরে নবজীবন লাভ করে।

সুকুমার রায়ের একমাত্র স্বীয় সম্পাদিত গ্রন্থ, 'আবোল তাবোল'-এর ৪৬টি পদ্যের মধ্যে ৩০টিই স্বরবৃত্তে রচিত। এই নির্বাচনের মধ্যে স্বরবৃত্তের প্রতি কবির প্রবল আকর্ষণের পরিচয় মেলে। দু'একটি উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে:

আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।

আয় যেখানে খ্যাপার গানে
　　নাইকো মানে নাইকো সুর,
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
　　মন ভেসে যায় কোন্ সুদূর।
　["আবোল তাবোল", 'আবোল তাবোল']

কিংবা

শিবঠাকুরের আপন দেশে,
আইন কানুন সর্বনেশে।
কেউ যদি যায় পিছলে প'ড়ে,
প্যায়দা এসে পাক্‌ড়ে ধরে,
কাজির কাছে হয় বিচার—
　একুশ টাকা দণ্ড তার॥...
　["একুশে আইন", 'আবোল তাবোল']

স্বরবৃত্তের ব্যবহারে সুকুমার রায়ের কবিতায় আবার চতুর্মাত্রার পর্ব এবং দ্বিপদী ছন্দের আধিক্য লক্ষণীয়।

স্বরবৃত্তের এই আধিক্য সত্ত্বেও ছন্দ-বিশেষজ্ঞ প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন যে মাত্রাবৃত্তরীতির প্রয়োগই সুকুমার রায়ের প্রধান কৃতিত্ব।[৭৪] তাঁর মতে, এই কৃতিত্বের মধ্যে রয়েছে;

ক. চতুর্মাত্রক মাত্রাবৃত্ত রচনায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন;
খ. দ্বিপদে বন্ধে উদাহরণ সৃষ্টি;
গ. পয়ারের মিল-ব্যবস্থায় নতুনত্বসঞ্চার; আটমাত্রিক পয়ারের সূচনা;
ঘ. পর্বান্ত্য ও পংক্তিপ্রান্ত্য মিলের ধারাবাহিকতা;
ঙ. ছন্দের তালপরায়ণতা (rhythm), বিচিত্র মিল rhyme ও স্পন্দিত মিল (rhythmic rhyme);
চ. জয়দেবী ত্রিপদীর বাংলা প্রতিরূপ রচনা;
ছ. মাত্রাবৃত্তে মহাচৌপদীর সৃষ্টি:
জ. তোটক, পজ্‌ঝটিকা প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দের সহজ প্রয়োগ;
ঝ. Free Verse-এর সার্থক ব্যবহার।

সুকুমার রায়ের কবিতাসমগ্রে অক্ষরবৃত্তের স্থান সংকীর্ণ। "পরিবেষণ", "সম্পাদকের দশা" প্রভৃতি অক্ষরবৃত্তের উপস্থিতি তাঁর রচনায় বিরল ব্যতিক্রম।

সুকুমার রায়ের ছন্দ-সচেতন মনের আর একটি পরিচয় বিধৃত রয়েছে ছন্দের কারণে পদ্যের শব্দপরিবর্তনের মধ্যে। 'সন্দেশ'-এ মুদ্রিত কবিতা 'আবোল তাবোল'-এ গ্রথিত করার সময় তিনি এ-ধরনের বহু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন করেন।[৭৫] ছন্দ সম্পর্কে সুকুমার রায় এত সচেতন ছিলেন যে তাঁর কবিতাসমগ্রে ছন্দপতন বিরল।

শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার—এই উভয়ই সুকুমার রায়ের পদ্যরচনায় বহুল ব্যবহৃত। অনুপ্রাস, যমক, উপমা, রূপক, চিত্ররূপ প্রভৃতি তাঁর পদ্যে উজ্জ্বলভাবে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহারে ও যমক সৃষ্টিতে আধুনিক বাংলা কবিতায় সুকুমার রায় অনুসরণযোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। যেমন :

অনুপ্রাস : চলে খচ্‌খচ্‌ রাগে গজ্‌গজ্‌ জুতা মচ্‌মচ্‌ তানে,
ভুরু কট্‌মট্‌ ছড়ি ফট্‌ফট্‌ লাথি চট্‌পট্‌ হানে।

দেখে বাঘ-রাগ লোকে 'ভাগ্‌ ভাগ্‌' করে আগভাগ থেকে,
ভয়ে লাফ ঝাঁপ বলে 'বাপ্‌ বাপ্‌' সবে হাবভাব দেখে।

লাথি চার চার খেয়ে মার্জার ছোটে যার যার ঘরে,
মহা উৎপাত ক'রে হুট্‌পাট্‌ চলে ফুটপাথ পরে।
["তেজিয়ান", 'খাই খাই']

যমক : এক ছিল দাঁড়ি মাঝি—দাড়ি তার মস্ত,
দাড়ি দিয়ে দাঁড়ি তার দাঁড়ে খালি ঘষ্‌ত।
["দাঁড়ের কবিতা", "খাই খাই']

রসসৃষ্টি ও শিল্পরূপের প্রয়োগ—উভয় ক্ষেত্রেই সুকুমার রায় উচ্চ পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। অতিরেক বা শিল্পরূপ তৈরীতে এই সংযম যে তাঁর সচেতন প্রয়াস, তার প্রমাণ ইতিপূর্বে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে 'খাই খাই'-এর শিরোনামাহীন সূচক রচনার দুটি পংক্তি স্মর্তব্য :

বেশ বলেছ, ঢের বলেছ, ঐখেনে দাও দাঁড়ি
হাটের মাঝে ভাঙ্‌বে কেন বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি।

এই সচেতন শিল্প-সংযমের চিহ্ন পাওয়া যায়, যখন 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত পদ্য আকারে ও প্রকারে সুসম্পাদিত হয়ে স্থান লাভ করে 'আবোল তাবোল' গ্রন্থে। এই সম্পাদনার গুণেই সুকুমার রায়ের কবিতার গঠন-সৌকর্য জ্যামিতিক চিত্রের ন্যায় নিখুঁত।

ননসেন্সের আপাত-অর্থহীনতার কারণে সুকুমার রায়ের পদ্য-রচনার গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন সহজসাধ্য নয়। সুকুমার-বিশেষজ্ঞ লীলা মজুমদার দাবী করেন যে সুকুমার-পদ্যের প্রতিটি পদ, শব্দ ও আঁচড় যুগপৎ অর্থ ও রসে টৈটম্বুর।[৯৬] এই অর্থ যখন তাৎক্ষণিক তাৎপর্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখনই তা হয়ে ওঠে কবিতা। জীবনানন্দ দাশ মনে করেন যে সুকুমার রায়ের পৃথিবীর মধ্যে যে পৃথিবী, তা বাস্তব না হয়েও পরিচিত ও সত্য।[৯৭] নীরেন্দ্র-নাথ চক্রবর্তীর মতে সুকুমারের রচনায় অর্থের দ্বিতীয় এমন কি তৃতীয় স্তরও উপস্থিত বহিঃরসের অনর্থের আড়ালে।[৯৮] শঙ্খ ঘোষ আবার অন্যভাবে বলেন যে সুকুমার খেয়ালের আর কল্পনার 'দুই ভিন্ন তলে একই সঙ্গে ঘুরে বেড়ান।[৯৯] এ-সবের উদাহরণ হিসেবে 'আবোল তাবোল'-এর সমাপ্তিসূচক রচনার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যায়:

মেঘ মুলুকে ঝাপ্‌সা রাতে,
রামধনুকের আব্‌ছায়াতে,...
আলোয় ঢাকা অন্ধকার,
ঘন্টা বাজে গন্ধে তার।
গোপন প্রাণে স্বপন দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চ ভূত!...
আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।...

অধিকাংশ রচনায় সুকুমার রায়ের কবি-কল্পনার প্রসার অত্যন্ত উচ্চমানের। পরিস্থিতি পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও শিল্পবোধের সুষম মিশ্রণ, অনুপম ভাববঞ্জনা, কৌতুকমিশ্রিত কল্পনাভঙ্গী সুকুমার

পদ্যসমগ্রে সুলভ। তার সঙ্গে সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বে গভীর দখল মিলে সৃষ্টি হয় উচ্চমানের কবিতা :

বিদ্ঘুটে রাত্তিরে ঘুট্ঘুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশ্মিশে মখ্মলে ঢাকা।
জট্বাঁধা ঝুল্ কালো বটগাছতলে,
ধক্ধক্ জোনাকির চক্মকি জ্বলে,...
পুবদিকে মাঝরাতে ছোপ্ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।...
["হুলোর গান", 'আবোল তাবোল']

কবিতার একটি লক্ষ্য বিশেষের মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করে তোলা। অত্যন্ত উচ্চমানের কবিকল্পনার বলে সকুমার রায় পরিচিত পৃথিবীর এবং অপরিচিত জগতের যে সহজ মূর্তিটি গড়ে তোলেন তাঁর রচনায়, সে পরিবেশ বা মূর্তিকে visualize করা যায়। সুকুমার রায়ের কবিতা তাই দৃশ্যপাঠ্য। কুমড়োপটাশ, হুঁকুমুখো হ্যাংলা, রামগরুড়ের ছানা প্রভৃতি এই গুণেই পরিণত হয়েছে চিরায়ত চরিত্রে। নাগরিক কবির বৈশিষ্ট্য হৃদয়ানুভূতিকে প্রচ্ছন্ন রেখে নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিমূর্তকে প্রকাশ, অতুলনীয় পর্যবেক্ষণশক্তি, কবি-জনচিত optimism, বিজ্ঞান ও খেয়ালের মিশ্রণ, কল্পনার সঙ্গে objectivism-এর সমন্বয় প্রভৃতি গুণাবলী সেই বিশেষের মূর্তিকে যতটা বিশিষ্ট করে তোলে, বাংলা কবিতায় তার তুলনা খুব বেশী নেই।

বুদ্ধদেব বসুর বিবেচনায় সুকুমার রায়ের imagination ও conception অনন্য, তিনি বহুসংখ্যক serious কবিতার লেখক,[১০০] এবং তাঁর পদ্যের সীমা কবিতার স্তর স্পর্শ করে যায়।[১০১] বুদ্ধদেবের ভাষায় :

> তাঁকে [সুকুমার রায়কে] কবি ব'লে না-মানতে হ'লে 'কবি' কথাটায় অন্যায়ভাবে সীমানা টানতে হয়।[১০২]

তথ্যনির্দেশ

১ এই অনুচ্ছেদের তথ্যসমূহের জন্য দ্রষ্টব্য
লীলা মজুমদার : 'সুকুমার রায়', লীলা মজুমদার রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, জুলাই ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৮৪, এবং

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী: 'সুকুমার রায়ের আশ্চর্য জগৎ,' আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১২

২ See, Seton, Marie. *Potrait of a Director : Satyajit Roy*, Vikas publication, Delhi. 1972. Pp 43. 46.

৩ এই অনুচ্ছেদের তথ্যসমূহের জন্য দ্র.
লীলা মজুমদার: "আমার বড়দা"। 'দেশ', ৫৩ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ. ৬০-৬৩;
সিদ্ধার্থ ঘোষ: "উহ্যনাম পণ্ডিতের সোজা কথা"। 'প্রস্তুতি-পর্ব', (অনুপম মজুমদার ও আশীষ লাহিড়ী সম্পাদিত), ৭ম খণ্ড ৩-৪ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮২, কলিকাতা, পৃ. ১৬
লীলা মজুমদার: 'লীলা মজুমদার রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

৪ অনুচ্ছেদের তথ্যসমূহের জন্য দ্র.
পার্থ বসু: "রবীন্দ্রনাথের তরুণ বন্ধু", 'দেশ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬ এবং কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী: "সুকুমার রায়ের আশ্চর্য জগৎ", পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৫ পুণ্যলতা চক্রবর্তী: "ছেলেবেলার দিনগুলি", নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা-১৯, পৃ. ৯, ১২৮

৬ সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু (সম্পাদিত): 'সুকুমার রায়' সমগ্র শিশু সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ৫ম সং, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ (১ম সং, বৈশাখ ১৩৮৩), দ্র. ভূমিকাংশের প্রথম পৃষ্ঠা।

৭ দ্র. সিদ্ধার্থ ঘোষ: "উহ্যনাথ পণ্ডিতের সোজা কথা", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

৮ See, Seton, Marie. *Potrair of a Director : Satyajit Roy*. Ibid. p. 50

৯ লীলা মজুমদার, 'লীলা মজুমদার রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৬

১০ See, Seton, Marie. *Potrait of a Director : Satyajit Roy*, Ibid. p. 57

১১ দ্র. খগেন্দ্রনাথ মিত্র: 'শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য'। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রা: লি:, কলকাতা, দ্বি-সং: জুলাই ১৯৬৭ ১ম সং, সেপ্টেম্বর ১৯৫৮)। পৃ. ২২-২৩

১২ দ্র. সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু (সম্পাদিত): 'সুকুমার রায় সমগ্র শিশুসাহিত্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

১৩ অনুচ্ছেদের তথ্যসমূহের জন্য দ্র. পুণ্যলতা চক্রবর্তী, "ছেলেবেলার দিনগুলি", পূর্বোক্ত, পৃ. ২০, ৬৮

১৪ সমীর মৈত্র (সম্পাদিত): 'সুকুমার সমগ্র রচনাবলী', (প্রথম খণ্ড), এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা-১৯, পৃ. ৭

১৫ লীলা মজুমদার: 'লীলা মজুমদার রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১

১৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

১৭ দ্র. সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু (সম্পাদিত): 'সুকুমার রায় সমগ্র শিশুসাহিত্য',: পূর্বোক্ত, ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠা।

১৮ See, Seton, Marie. *Potrait of a Director : Satyajit Roy*, Ibid p. 56

১৯ দ্র. সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু (সম্পাদিত): 'সুকুমার রায় সমগ্র শিশুসাহিত্য', পূর্বোক্ত, ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠা।

২০ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু (সম্পাদিত): 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, মে, ১৯৭৬, পৃ. ৫৫৬

২১ দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৬

২২ See, Seton, Marie. *Potrait of a Director : Satyajit Ray*, Ibid. p. 56

২৩ See, Ibid. p. 56

২৪ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু (সম্পাদিত): 'সংসদ বাঙালী চরিত্রাভিধান', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৭

২৫ এই অনুচ্ছেদের তথ্যসমূহের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. সিদ্ধান্ত ঘোষ: "বিজ্ঞান-কর্মী সুকুমার", দ্র. 'দেশ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০-৭৪

২৬ বিলেত থেকে পরিবারের সদস্যদের কাছে লেখা সুকুমারের চিঠিপত্রে এর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।
দ্র. লীলা মজুমদার: 'লীলা মজুমদার রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭-১৭৭

২৭ পার্থ বসু: "রবীন্দ্রনাথের তরুণ বন্ধু", দ্র. 'দেশ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

২৮ সুকুমার রায়ের পূর্বে উল্লেখিত চিঠিপত্রে এর বিবরণ রয়েছে।

২৯ অনুপম মজুমদার ও আশীস লাহিড়ী (সম্পাদিত): 'প্রস্তুতি-পর্ব', পূর্বোক্ত, দ্র. "আমাদের কথা"।

৩০ কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী. "সুকুমার রায়ের আশ্চর্য জগৎ", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৩১ সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু (সম্পাদিত) 'সুকুমার রায় সমগ্র শিশুসাহিত্য', পূর্বোক্ত, দ্র. ভূমিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠা

৩২ দ্র. পূর্বোক্ত,

৩৩ দ্র. লীলা মজুমদার, 'লীলা মজুমদার রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

৩৪ দিলীপকুমার বিশ্বাস, "সুকুমার রায় ও ব্রাহ্মসমাজ", দ্র. 'দেশ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫

৩৫ সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্য, দ্র. সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু (সম্পাদিত): 'সুকুমার রায় সমগ্র শিশুসাহিত্য', পূর্বোক্ত, ভূমিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা।

৩৬ কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, "সুকুমার রায়ের আশ্চর্য জগত", পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬

৩৭ এ-বিষয়ে সুকুমার রায়ের মানসিক দ্বন্দ্বের স্বীকারোক্তি রয়েছে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে ২৩-৮-১৯২০ তারিখে লেখা একটি দীর্ঘ চিঠিতে; দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২-১২৬

৩৮ সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু (সম্পাদিত): 'সুকুমার রায় সমগ্র শিশুসাহিত্য', পূর্বোক্ত, ভূমিকার তৃতীয় পৃষ্ঠা

৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আমার যুবক বন্ধু", দ্র. 'দেশ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

৪০ Seton, Marie. *Potrait of a Director : Satyajit Roy,* Ibid. p. 61

৪১ এর কয়েকটি নমুনা রয়েছে 'প্রস্তুতিপর্ব' (পূর্বোক্ত)-এর ক্রোড়পত্রে, দ্র. পৃ. ১-৮

৪২ তথ্য-উৎসের জন্য দ্র.
সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু (সম্পাদিত): 'সুকুমার রায় সমগ্র শিশুসাহিত্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬

৪৩ দ্র. পূর্বোক্ত,

৪৪ দ্র. পূর্বোক্ত,

৪৫ দ্র. পূর্বোক্ত,

৪৬ দ্র. পূর্বোক্ত,

৪৭ দ্র. পূর্বোক্ত,

৪৮ এই পদ্যটির একটি অসংস্কৃত রূপ প্রথম প্রকাশিত হয় 'মুকুল' পত্রিকার ১৩১৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায়, দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬

৪৯ সুকুমার রায়: 'বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ", সিগনেট প্রেস, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৬৩

৫০ দ্র. সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু (সম্পাদিত): 'সুকুমার রায় সমগ্র শিশুসাহিত্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

৫১ দ্র. পূর্বোক্ত,

৫২ দ্র. পূর্বোক্ত,

৫৩ দ্র. পূর্বোক্ত,

৫৪ দ্র. পূর্বোক্ত,

৫৫ দ্র. পূর্বোক্ত,

৫৬ পুলক চন্দ: "সুকুমারের নাটক", দ্র. 'প্রস্তুতিপর্ব', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২-১৭৭

৫৭ সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু (সম্পাদিত): 'সুকুমার রায় সমগ্র শিশুসাহিত্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

৫৮ দ্র. পূর্বোক্ত,

৫৯ দ্র. পূর্বোক্ত,

৬০ দ্র. পূর্বোক্ত,

৬১ দ্র. পূর্বোক্ত,

৬২ দ্র. পূর্বোক্ত,

৬৩ দ্র পূর্বোক্ত,

৬৪ দ্র. পূর্বোক্ত,

৬৫ পার্থ বসু, "রবীন্দ্রনাথের তরুণ বন্ধু", দ্র. 'দেশ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

৬৬ এ-ধরনের একটি পদ্যে লেখা চিঠি গিরিধি থেকে রোগশয্যায় বসে (৮.১.১৯২২) লিখেছিলেন কলকাতায় মিসেস এস. কে. দত্তকে। পরে 'কলিকাতা কোথারে' শিরোনামে এটি ছাপা হয়। দ্র. সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত): 'পাতাবাহার', ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ, কলকাতা, ১৩৬২, পৃ. ১

৬৭ দ্র. নির্মাল্য আচার্য (সম্পাদক) : 'এক্ষণ', শারদীয় ১৩৮৯ ও গ্রীষ্ম ১৩৯১ সংখ্যা, কলকাতা

৬৮ দ্র. লীলা মজুমদার, 'লীলা মজুমদার রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭-১৭৭

৬৯ অনুপম মজুমদার ও আশীষ লাহিড়ী (সম্পাদিত): 'প্রস্তুতি পর্ব', পূর্বোক্ত, দ্র. সম্পাদকীয়।

৭০ অনুপম মজুমদার ও আশীষ লাহিড়ী (সম্পাদিত): 'প্রস্তুতি-পর্ব', পূর্বোক্ত, দ্র. 'আমাদের কথা'

৭১ সমীর মৈত্র (সম্পাদিত): 'সুকুমার রায় সমগ্র রচনাবলী' (দ্বিতীয় খণ্ড), এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৭৫

৭২ সুকুমার রায়: 'আবোল তাবোল' সিগনেট প্রেস, কলকাতা, পৌষ ১৩৬২ (১ম সং ১৯২৩), দ্র. কৈফিয়ৎ

৭৩ দ্র. 'প্রস্তুতিপর্ব', পূর্বোক্ত-এর ক্রোড়পত্রে 'হিজিবিজি' খাতার কাটাকুটি করা পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখিত চারটি লাইন।

৭৪ অজিত দত্ত: "বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস". জিজ্ঞাসা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৬০, পৃ. ৪৩২

৭৫ দ্র. সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু (সম্পাদিত): সুকুমার রায়', 'সমগ্র শিশু সাহিত্য: পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

৭৬ অনুপম মজুমদার ও আশীষ লাহিড়ী (সম্পাদিত): 'প্রস্তুতি পর্ব', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

৭৭ সুকুমার রায়: 'বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

৭৮ See, Cuddon, J. A. *A Dictionary of Litarary Terms*. Penguin Books. 1986 (Ist ed, 1977). p. 428

৭৯ বুদ্ধদেব বসু: "বাংলা শিশুসাহিত্য", 'সাহিত্য চর্চা', সিগনেট প্রেস, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৬১, পৃ. ৫৩

৮০ দ্র. সুকুমার রায়: "কৈফিয়ৎ", 'আবোল তাবোল', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই।

৮১ দ্র. লীলা মজুমদার: 'লীলা মজুমদার রচনাবলী', (তৃতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০, ১৪০

৮২ সুকুমার রায়: "বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ", পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০, ৭৫

৮৩ সুবীর রায় চৌধুরী ও অমিয় দেব (সম্পাদিত): 'বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, মাঘ ১৩৮১, পৃ. ৫৭৮

৮৪ সুকুমার সেন: "ছেলেমি রচনা ও সুকুমার রায়", 'দেশ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৮৫ অজিত দত্ত: "বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস", পূর্বোক্ত. পৃ. ৪৫২

৮৬ দ্র. রাজশেখর বসু: "সাহিত্যের পরিধি", "চলচ্চিন্তা", 'পরশুরাম গ্রন্থাবলী', (দ্বিতীয় খণ্ড), এম-সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৮৫ (১ম সং ১৩৭৩), পৃ. ৩৬৭

৮৭ এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র.
সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ: 'ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি' (অপ্রকাশিত পি এইচ ডি. অভিসন্দর্ভ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা,

৮৮ দ্র. পূর্বোক্ত,

৮৯ নমুনার জন্য দ্র.
সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত): 'দেশ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩-৪৭

৯০ দ্র. অজিত দত্ত: "বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস", পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৪

৯১ সুকুমার রায়: "বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ", পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

৯২ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৯৩ সুকুমার রায়: "ছেলেমি রচনা ও সুকুমার রায়", দ্র. সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), 'দেশ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৯৪ প্রবোধচন্দ্র সেন: "ছন্দশিল্পী সুকুমার রায়", দ্র. পূর্বোক্ত পৃ. ২৭-৩৬

৯৫ উদাহরণের জন্য দ্র.
শঙ্খ ঘোষ: "অসম্ভবের ছন্দ", 'প্রস্তুতিপর্ব', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪

৯৬ লীলা মজুমদার: "সুকুমার রায়", 'লীলা মজুমদার রচনাবলী', (তৃতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

৯৭ সিগনেট প্রেসকে ৩০.১০.১৯৪৩ তারিখে লেখা জীবনানন্দ দাশের একটি পত্রে এই মন্তব্য করা হয়েছে।
দ্র. ভারতী সেন: "আবোল তাবোল-এর কাব্যভাষা", 'প্রস্তুতিপর্ব', পূর্বোক্ত. পৃ. ৭৫

৯৮ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী: "কবি সুকুমার", 'দেশ', পূর্বোক্ত. পৃ. ২৪

৯৯ শঙ্খ ঘোষ: "অসম্ভবের ছন্দ", 'প্রস্তুতিপর্ব', পূর্বোক্ত পৃ. ১৫০

১০০ সুবীর রায়চৌধুরী ও অমিয় দেব (সম্পাদিত): 'বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ' (প্রথম খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, মাঘ ১৩৮১, পৃ. ৫৮৬, ৫৯৩

১০১ বুদ্ধদেব বসু: 'সাহিত্য চর্চা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

১০২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫